তৃতীয় অধ্যায়

রাজনীতির ভাঙা-গড়া : উপন্যাস ও গল্পে তার প্রতিফলন

রাষ্ট্র শব্দটির মধ্যে রয়েছে-রাজ্য, দেশ, বিষয়, জনপদ, রাষ্ট্রবাসী, প্রকৃতি, প্রজা, উপদ্রব, মকরাদি দুর্ভিক্ষ, প্রজাপীড়ন, রাজ্যশাসন, দেশবাসী, বিপ্লব, রাজ্যধ্বংস, দেশভাগ ইত্যাদি বিষয়গুলি। আর এই সমস্ত বিষয়গুলির সাথে জড়িয়ে রয়েছে রাজনীতি শব্দটি। অর্থাৎ রাজনীতি-রাজ্যশাসনবিধি। আমরা আলোচনা করব লেখক গৌরকিশোর ঘোষের উপন্যাস ও গল্পে রাজনীতির সেই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে রাজ্য-রাষ্ট্র-দেশ-রাজ্যশাসন রাষ্ট্রবাসী-দেশবাসী-দুর্ভিক্ষ-বিপ্লব এমনকি দেশভাগ নিয়ে। এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে গভীর আলোচনার আগে আমাদের জনা দরকার লেখক কেন এই বিষয়গুলিকেই তাঁর উপন্যাস ও গল্পের বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নিলেন? এই জিজ্ঞাসার উত্তর লুকিয়ে আছে লেখকের ব্যক্তিগত জীবন-জীবিকা এমনকি জীবন নির্বাহিত সময়ের প্রেক্ষাপটকে ঘিরে। গৌরকিশোর ঘোষের ছিল বর্ণময় ব্যক্তিত্ব, যা সচারচর অন্যান্য লেখক-সাহিত্যিকের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। তিনি ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত তিনি ক্রমাগত পেশা বদলেছেন। কখনো প্রাইভেট টিউটর, কখনো ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, কখনো বা খালাসি কখনো আবার রেস্তোরাঁর বয় বা ট্রেড ইউনিয়ন অর্গানাইজার, কখনো ইস্কুল মাস্টার থেকে ভ্রাম্যমাণ নৃত্য-সম্প্রদায়ের ম্যানেজার, ল্যান্ডকাস্টমস্ ক্লিয়ারিং কেরানি বা প্রুফ রিডার। অনেক অল্প বয়স থেকেই তাঁকে জীবন সংগ্রাম শুরু করতে হয়েছিল। এই সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই সংগ্রামী মানুষটির চরিত্র গড়ে উঠেছিল। আপসহীন, সত্যনিষ্ঠ, আদর্শবাদী একজন মানুষ ও লেখক। অম্লান দত্তের মনে হয়েছিল—'প্রেম, সদিচ্ছা, কৌতুকবোধ, নির্ভীকতা, এই ছিল গৌরের ব্যক্তিত্বের মূল উপাদান।' ['ওকে যেমন দেখেছি', দেশ, ২০জানুয়ারি ২০০৯][১]

গৌরকিশোর ঘোষ সাংবাদিকতাকেই শেষ পর্যন্ত জীবিকা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি একাধারে লেখক, পাশাপাশি সাংবাদিক। তিনি যে জীবনের রূপকার, সেই জীবনগুলোতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জমাট বেঁধেছে কঠিন অসুখ। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে চারিদিকে অজানা কালো ভয়। সামাজিক পরিমণ্ডলে ক্ষতের পরিমাণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনেও ক্ষতের পরিমাণ বেড়ে চলেছে। লেখক গৌরকিশোর ঘোষ কোনো ধরা-বাধা গতে রাজনৈতিক উপন্যাস বা গল্প লিখতে বসেননি। কারণ তাঁর কৈশোর যৌবন কেটেছে রাজনৈতিক ও সামাজিক জটিলতার মধ্য দিয়ে। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উত্তাপে, দেশীয় রাজনৈতিক নানান আন্দোলন, মন্বন্তর-দুর্ভিক্ষ দেশভাগ ইত্যাদি ঘটানার ভিতর দিয়ে। এক্ষেত্রে সাহিত্যিক সাংবাদিক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি নিজস্ব বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য—

> যাদের শৈশব রূপকথার নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছিল না, যাদের বাল্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছায়া ফেলল, যাদের কৈশোর গেল দাঙ্গা আর দেশ বিভাগে, সেই আমরা বিশ শতকের এই দ্বিতীয়ার্দ্ধের যুবকরা কী এক আশ্চর্য সমকালকেই না পৃথিবীকে ভালোবেসেছি। কী এক আশ্চর্য সময়। আশ্চর্য এই ভালোবাসা। [দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আমাদের যৌবন ও স্বাধীনতা' দৈনিক 'স্বাধীনতা' ২৫.১২.১৯৬০][২]

কিন্তু এখানেই শেষ নয়, স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে রাজনৈতিক সংকট ও ট্রেড ইউনিয়নের চরিত্রগুলিও প্রকাশিত হয়েছে তাঁর সামনে। আর তারই প্রতিফলন ঘটেছে উপন্যাস ও গল্পগুলিতে। সাহিত্য সমালোচক লেখক সন্তোষকুমার ঘোষ-এ সম্পর্কে একটি মন্তব্য করেছিলেন—''লেখকের শাণিত লেখনী নির্মোহ বিজ্ঞানীর বা নিরাসক্ত দার্শনিকের।

মধ্যবিত্ত সমাজের মর্ম ও অস্তিত্বকে ঐ লেখনীতে ব্যবচ্ছেদ করেন।" [মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে, বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস, পৃ. ১১৩][৩]

সমালোচকের মন্তব্যটি আমাদের আলোচ্য লেখক গৌরকিশোর ঘোষ সম্পর্কেও বিশষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

তবে এখানে বলে নেওয়া ভালো যে, সাহিত্য সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্যকোষ ও কথা সাহিত্য' গ্রন্থে রাজনৈতিক উপন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক তথা সাংবাদিকদের চরিত্র বিশ্লেষণে যে মন্তব্য করেছেন,তা আমাদের লেখক সম্বন্ধে যথাযথ নয় বলে আমার মনে হয়েছে।

> রাজনৈতিক উপন্যাসের অতি-প্রার্দুভাবের আর একটি পরোক্ষ ফল দাঁড়াচ্ছে যে এতে সাহিত্য ও সাংবাদিকতার মধ্যে সীমারেখা অস্পষ্ট ও বিলুপ্তপ্রায় হয়ে উঠেছে। উপন্যাস যেন প্রাত্যহিক ঘটনাবলির দিনলিপিতে পর্যবসিত হতে চলেছে। সংবাদপত্রের স্তম্ভে যে আবেগময় নিবন্ধ রচিত হয়, যে রকম আলোচনা প্রসার লাভ করে, সাহিত্যে তাই অকিঞ্চিৎকর পরিবর্তনের সঙ্গে ঔপন্যাসিক চরিত্রের সংলাপ ও মনোভাব বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিবেশিত হচ্ছে। সাংবাদিকের নৈর্ব্যক্তিকতা ঔপন্যাসিকের ব্যক্তি-চরিত্র চিত্রণের অক্ষম প্রয়াসে প্রায় অপরিবর্তিত—থাকছে ঔপন্যাসিক পাত্র-পাত্রীর মুখ দিয়ে সম্পাদকের বাণী ও বাচনভঙ্গিই আমাদের কাছে এসে পৌঁছচ্ছে। যা ঘটছে, যার বাস্তবরূপ আমাদের শিরা-স্নায়ু, চিন্তাকে অভিভূত করছে, যে বিতর্ক আমাদের সংশয় বুদ্ধিকে ঘুলিয়ে তুলছে, যে দ্রুত সঞ্চরণশীল ছায়াপটে প্রতিটি মুহূর্ত নিজ ক্ষণিক প্রতিচ্ছবি ফেলছে, তার ভবিষ্যৎ চিরন্তন প্রতিকৃতিটি সাহিত্যে ধরা পড়ছে না। বিভ্রান্তকারী বিক্ষোভের কেন্দ্রস্থলে সত্যের যে শাশ্বত মূর্ত্তি স্থির, অবিচলভাবে বিরাজমান—সাহিত্যিকের দৃষ্টি সেই গভীরতর স্তরে পৌঁছচ্ছে না। সমস্ত সহিত্য উৎকটভাবে প্রচারধর্মী, তাৎপর্যহীন বস্তুভারে পীড়িত, সাময়িক উদ্‌ভ্রান্তিতে বিহ্বল ও অস্বচ্ছ হয়ে উঠছে। এই প্রবণতা প্রতিরুদ্ধ না হলে সাহিত্যিক আদর্শই বিকৃত হয়ে পড়বে, সমস্ত সাহিত্যই সাময়িকতার মলিন, চঞ্চল আবরণে এর জ্যোতির্ময় সত্তাটি হারিয়ে ফেলবে। সাহিত্যিক অর্ন্তদৃষ্টির সংরক্ষণ বর্তমান কালের একটি প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। [পৃ. ১৯৬-১৯৭][৪]

কিন্তু উপরিউক্ত মন্তব্যটি আমাদের লেখকের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে ঠিক নয় বলে মনে হয়েছে। তার কারণগুলি হল—

(ক) তিনি প্রথমে লেখক, পরে সাংবাদিক। কারণ সাংবাদিকসুলভ দৃষ্টিকোণ থেকে জগৎ এবং জীবনকে দেখেননি, দেখেছিলেন লেখকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। জীবন ও জীবন যাত্রাকে শুধুমাত্র বাইরে থেকে দেখা নয়, একেবারে ভিতর থেকে দেখেছেন 'দিন রাত্তির সতর্কচোখে ঘুরেছি। যা দেখেছি, যেটা ভাল লেগেছ, তুলে ধরেছি।....'[৫]

(খ) গৌরকিশোর ঘোষ খুব বেশি লেখেননি। কারণ জীবিকা হিসেবে তিনি সাংবাদিকতাকেই বেছে নিয়েছিলেন। যা সত্যাশ্রয়ী লেখকের পক্ষে স্বাভাবিক। লেখক সম্বন্ধে গৌতম ভদ্র 'গল্প সমগ্র'-এর ভূমিকায় লিখেছেন—

> ক্ষমতা ও সুযোগ পেয়েও ভাষ্যকারের পথই গৌরকিশোর ঘোষ বেছে নিয়েছিলেন। পাবলিক তাঁর কাছে প্রিয়, ভারতের গণতন্ত্র নিয়ে তিনি অনুক্ষণ চিন্তা করছেন।পার্টিতন্ত্রের তিনি ঘোরবিরোধী কিন্তু ব্যক্তিমানুষের রাজনৈতিক অধিকারের পক্ষে। কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে তাঁর আপত্তি তীব্র, সেটা অভিজ্ঞতাজনিত। অন্যপক্ষে ফ্যাসিবাদ-এর বিরুদ্ধেও তাঁর ঘৃণা আত্যন্তিক। রাজনীতিতে গৌরকিশোর মানবেন্দ্রনাথ রায়ের শিষ্য। সামাজিক অসাম্য বিরোধী কিছু পন্থায় অহিংস ও মানবতাবাদী। তাঁর আদর্শ যেন শরৎ মাস্টার মশায়, তাঁর কাছে বিপ্লব ও স্বাধীনতা দুটি গোড়াগুলি আলাদা, মিলিয়ে ফেললেই সর্বনাশ। স্বাধীনতা উঁচু ডালের ফল নয়। কোনও দূর গোপন স্থানে তা অপেক্ষা করে নেই কারো জন্য। প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীন হচ্ছি একটু একটু করে, আবার স্বাধীনতা বিসর্জনও দিচ্ছি। অল্প বয়স থেকেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অগ্রসর হয়েছে লেখক। লেখকের তীব্র পর্যবেক্ষণশক্তি, কৌতুকবোধ সরস সজীব ভাষা তাঁর চোখে দেখা রূঢ়কঠোর বাস্তবকেও উপভোগ্য করে তুলেছিল।[৬]

গৌরকিশোর ঘোষের সাংবাদিক সত্তার আড়ালে তাঁর অসামান্য লেখক সত্তাটি হারিয়ে গেছে। বাঙালি সাহিত্যিকেরা এক সময় মধ্যবিত্ত জীবনের সুখ দুঃখ নিয়েই উপন্যাস ও গল্প লিখেছেন। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বের বেশির ভাগ সাহিত্যিকরা স্বাধীনতার ইতিহাস, বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস, মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ বিশেষ করে স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে মধ্যবিত্ত সমাজ ও জীবনের দ্রুত অবক্ষয়কে নিয়ে উপন্যাস ও গল্পের কাহিনির প্লট নির্মাণ করেছেন। অনেক সাহিত্য সমালোচকের ভাষায় উত্তাল চল্লিশ দশক হল—এক আলো-আঁধারি যুগের বহুমাত্রিক আখ্যান। চল্লিশের দশক ইতিহাসে এক ব্যতিক্রমী অধ্যায়। সমগ্র চল্লিশ দশক জুড়ে-যুদ্ধ-আকাল-দেশজোড়া গণ অভ্যুত্থান ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার মতো যুগান্তকারী ঘটনার সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে অমলেন্দু সেনগুপ্ত বলেছেন—

> বিখ্যাত ইংরেজ কথাশিল্পী চার্লস, ডিকেন্স ফরাসি বিপ্লবের দিনগুলির সারাৎসার বর্ণনা করেছিলেন একটি মাত্র বাক্যে ঃ It was the best of time-it was the worst of time. বিগত শতকের চল্লিশের দশকের দিনগুলিকেও ঠিক একইভাবে বলা যায়, সে বড় সুসময় সে বড় দুঃসময়। একদিকে যখন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম গণঅভ্যুত্থানের রূপ নিয়েছে, ঠিক তখনই ঘটল পট পরিবর্তন সাম্প্রদায়িক হানাহানির আকারে। অবশেষে স্বাধীনতা এল, কিন্তু সঙ্গে নিয়ে এল দেশভাগের অভিশাপ।
>
> যখন মনে হচ্ছিল সবই শেষ, ঠিক সে সময় কমিউনিস্ট পার্টি যুগিয়েছিল শ্রমজীবী মানুষের মনে নতুন করে বাঁচার প্রেরণা—দিয়েছিল নতুন পথের সন্ধান। শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন সঙ্গে নিয়ে সমাজ বিপ্লবের পথ। সে স্বপ্ন শেষপর্যন্ত বাস্তবের জমি খুঁজে পেল না। [দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা, উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব] [৭]

শুধু শহর নয়, সেদিনের গ্রামবাংলার মানুষ নিছক বাঁচার জন্য কঠিন লড়াইয়ে ব্যস্ত। গ্রামবাংলার ছিন্নভিন্ন মানুষগুলো হয়ে উঠেছিল বাংলা উপন্যাস-গল্প-কবিতার প্রধান বিষয় বস্তু। তাদের মর্মন্তুদ কাহিনি সাহিত্যের বিশ্বস্ত দলিল। সেই সময় ভারত তথা বাংলার রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল নানা ধরনের জটিলতা। বিশেষ করে বাংলা তথা ভারতবর্ষে যে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা শুরু হয়েছিল তাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপান-উতোর ক্রমশ বৃদ্ধি পেতেই থাকে। এই সম্পর্কে কবি মির্জা গালিবের বিবরণের কথা স্মরণ করা যেতে পারে—'হিন্দুস্তান আজ বিধ্বংসী ঝড় আর লেলিহান আগুনের লীলাক্ষেত্র হয়ে উঠেছে।' [পৃ. ১২] [৮] মির্জা গালিবের কথা আমাদের স্মরণ করার কারণ হল, তিনি ছিলেন একজন কবি ও সাহিত্যিক, রামচন্দ্র গুহ তাঁর সম্পর্কে বলছেন যে—''ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা সেদিন যা বুঝতে পারেনি, ভারতীয় জাতীয়তবাদীরা আজও যা বুঝে উঠতে পারেন না, সেটা স্পষ্ট করে বুঝে ছিলেন গালিব।''[পৃ....] [৯] এই কথাগুলি এখানে বলার কারণ হল, একজন সাহিত্যিকই পারেন সমাজের গভীর ক্ষত থেকে আসল সত্যটাকে বের করে আনতে। যা আমাদের লেখক গৌরকিশোর ঘোষ সম্পর্কেও একইভাবে প্রযোজ্য। গৌরকিশোর ঘোষ লেখকের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সমাজের গভীরে লুকিয়ে থাকা সত্যকে উদ্‌ঘাটন করেছেন।

আমরা উপন্যাস ও গল্পে রাজনৈতিক নানান কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করার আগে লেখকের নিজস্ব রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে আলোচনা করা দরকার। তাহলে উপন্যাস ও গল্পের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বুঝতে সুবিধে আমাদের সুবিধে হবে। লেখকের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক ভাবাদর্শকে যদি বিশ্লেষণ করে দেখি, তাহলে দেখব যে, সমগ্র জীবন ধরে তিনি নানান রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে লক্ষ করেছিলেন। ফলে তিনি রাজনীতির প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতির সাথে সেইভাবে কোনোদিনই যুক্ত ছিলেন না। তবে তিনি পনেরো বছর বয়সে অবিভক্ত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রশাখার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ দ্বারা তিনি প্রভাবিত হননি। পরে তিনি শ্রমিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তবে একথা না বললেই নয়, তিনি কিছুটা মানবন্দ্রেনাথ রায়ের মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। মানবেন্দ্রনাথের র‍্যাডিকাল ডেমোক্রেটিক পার্টিতে যোগ দেওয়ার অপরাধে যুদ্ধের সময়ে একাধিক চাকরি পেয়েও বেশিদিন করার সুযোগ পাননি। মানবেন্দ্রনাথের জীবনে নিজস্ব রাজনৈতিক মনন ধারা মোটামুটিভাবে তিনটি পর্যায়ে বিবর্তিত হয়েছে। প্রথমে তিনি

জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের দ্বারা তারপর সেখান থেকে মার্কসবাদী মতাদর্শ দ্বারা, এবং ক্রমে ক্রমে তিনি নবমানবতাবাদে উপনীত হয়েছেন। তিনি সমকালীন ভারতীয় গণভ্যুত্থানের ভিতর শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ মানুষের বিপ্লবী সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন। একই সঙ্গে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে, উদীয়মান দেশীয় পুঁজিবাদী শক্তি দেশের কৃষি সম্পদকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ফলে কৃষকেরা একাধারে দেশীয় ও বিদেশি শোষকদের হাতে নিগৃহীত হচ্ছে। জমিতে নিয়োজিত বিপুল পুঁজির একচেটিয়া স্বত্ব পুঁজিপতিদের হাতে থাকায় গ্রামবাসী ও কৃষিজীবীরা নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। মানবেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন বস্তুবাদী চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্পর্কে তিনি মনে করেছিলেন—

> জাতীয়তাবাদের উৎস হল হৃদয়াবেগ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিজ্ঞানসম্মত সমাজদর্শনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠেনি। জাতীয়-স্বাধীনতার তাগিদে মানুষের মনে অন্ধ দেশহিতৈষা ও জাতিবিদ্বেষ দেখা দেওয়ায় স্বাধীন চিন্তা শক্তিও লুপ্ত হয়ে গেছে। জাতীয় স্বাধীনতার প্রকৃত লক্ষ্য অর্থাৎ মানুষের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি সাধন উপেক্ষিত হয়েছে। [বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা, সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ১৩৭][১০]

তিনি আরো মনে করেছিলেন—"জাতীয়তা, অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাস ও রাজনৈতিক নিশ্চেতনার সুযোগে কংগ্রেস ও লিগই সেই নির্বাচনে জয়ী হয়। তাদেরই সম্মতিতেতে দেশকে দুভাগ করে ইংরেজ শাসক বুর্জোয়া শ্রেণির হাতে শাসন ক্ষমতা তুলে দিয়ে চলে যায়।" [সমগ্রন্থ, পৃ. ৪২২][১১]

ভারতের প্রকৃত মুক্তি কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির উপর নির্ভরশীল কিন্তু ভারতবর্ষের বুর্জোয়া শ্রেণি নিজেদের স্বার্থে ইংরেজদের সঙ্গে হাত মেলায়। নিরক্ষর মূঢ়, ধর্মান্ধ দেশবাসীর আবেগ ও উন্মাদনার সুযোগ নিয়ে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণি নিজেদের কাজ হাসিল করতে তৎপর হয়েছিল। রাষ্ট্রের ওপরতলার মানুষদের মধ্যে রয়েছে স্বার্থসর্বস্বতা, লোভ, ঈর্ষা, ক্ষমতার মোহ এবং সেই সঙ্গে রয়েছে ক্ষমতা দখলের লড়াই। সেই ক্ষমতা দখলের আস্ফালনে ভারত আজ দ্বি-খণ্ডিত। শুধু ভারতবর্ষই নয়, বাংলাও আজ দ্বি-খণ্ডিত। সেই সঙ্গে বাংলার মানুষের ভালোবাসা একতা সমস্তই আজ দ্বিধা-বিভক্ত। হিন্দু-মুসলমান আপন জাতিগত পরিচয়টাকে একটা সময় বড়ো করে দেখতে শুরু করে। ফলে অবিভক্ত বাংলায় জন্ম নেয় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। একে কেন্দ্র করেই যেন তৎকালীন কংগ্রেসের মধ্য শুরু হয় ভাঙন, জন্ম হয় মুসলিম লিগের পাশাপাশি হিন্দু-মহাসভার বাড়বাড়ন্ত রূপ।

স্বাধীনতা পূর্ব ও পরবর্তী বিশেষ করে সমসাময়িক বাংলার রাজনৈতিক ঘটনাকে কেন্দ্রে রেখে লেখক গৌরকিশোর ঘোষ উপন্যাস ও গল্পে সমাজকে নিরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর কথা সাহিত্যে রাজনীতির প্রতিফলন সন্ধানে লেখকের রাজনৈতিক ভাষ্যই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। তাঁর কথা সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে বাংলা রাজ্য-রাজনীতির দর্পণে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস-হতাশা ও সঙ্কট-উৎক্রান্তির নগ্নরূপ। বাংলার রাজনৈতিক আবহ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই নগ্নতা আরো প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে। আর সেই রাজনৈতিক নগ্নতাকেই প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন লেখক তাঁর উপন্যাস ও গল্পগুলিতে। স্বাধীনতার পরও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিষে জর্জরিত হয় বাঙালি। তার জের আজও চলেছে সমাজে। আবার বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে যে কমিউনিজমের আনাগোনা শুরু হয় এদেশে স্বাধীনতার পর দুয়ের দশকে সেই বামপন্থী আন্দোলনে আবার শুরু হয় ভাঙা-গড়ার খেলা, জন্ম হয় C.P.I, C.P.I.M, C.P.I.M.L প্রভৃতি গোষ্ঠীর। আমরা উপন্যাস ও গল্পে সেই সমস্ত দিক বিচার করে রাজনৈতিক সময়সীমাকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছি—(১) ১৯২১-১৯৪০, (২) ১৯৪০-১৯৬০, (৩) ১৯৬০-১৯৮০।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস এবং তৎপরবর্তী ইতিহাস ঐতিহাসিকেরা তথ্য সমৃদ্ধপূর্ণভাবে ইতিহাসগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু রাজনীতির ভাষ্য সেখানে কোথাও যেন তথ্যের ভারে চাপা পড়ে যায়। কারণ ঐতিহাসিকের কাছে তথ্যই প্রধান, সমাজ মনস্তত্ত্ব নয়। আর সমাজ মনস্তত্ত্বের মধ্যেই লুকিয়ে আছে ব্যক্তি ও দলের নানা ধরনের রাজনীতির মতাদর্শ। অর্থাৎ ইতিহাস রাজনীতির ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ। তা সঠিকভাবে দিতে পারেন সমাজ মনস্তাত্ত্বিকেরা বা সাহিত্যিকেরা।

এবার আমরা গৌরকিশোর ঘোষের উপন্যাসের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের বাংলা তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের আলো-আঁধারি ভাঙাগড়ার কাহিনি দেখব। তার আগে আমাদের ঔপন্যাসিকের উপন্যাস তালিকাটি একবার দেখে নেওয়া দরকার।

(ক) জল পড়ে পাতা নড়ে—মে ১৯৭৮

(খ) প্রেম নেই—সেপ্টেম্বর ১৯৮১ ট্রিলজিমূলক উপন্যাস।

(গ) প্রতিবেশী—আগস্ট ১৯৯৫

(ঘ) এই দাহ—ফেব্রুয়ারি ১৯৬২

(ঙ) মনের বাঘ—চৈত্র ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।

(চ) লোকটা—মে ১৯৬৬ (প্র. স.), এপ্রিল ১৯৬৭ (দ্বি. স) ডিসেম্বর ১৯৭০ (তৃ. স.)

(ছ) গড়িয়াহাট ব্রিজের উপর থেকে দুজনে—জানুয়ারি ১৯৭২

(জ) এক ধরনের বিপন্নতা—ফেব্রুয়ারি ১৯৮১

(ঝ) কমলা কেমন আছে—জানুয়ারি ১৯৮৫

'জল পড়ে পাতা নড়ে' 'প্রেম নেই' এবং 'প্রতিবেশী' উপন্যাস তিনটির সময়সীমা হিসেবে লেখক বেছে নিয়েছিলেন ১৯২২-৪৬ সাল পর্যন্ত ২৫ বছর সময়কালকে। এই সময়কালটি ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। শুধুমাত্র দলগত রাজনীতি ভারতীয় মানচিত্রের বদল ঘটায়নি, সেই সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে। ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে সংঘাত ক্রমশ গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বে এবং শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে পৌঁছে কীভাবে দেশকে খণ্ড খণ্ড করেছে তার চিত্রণ চিত্রিত হয়েছে উপন্যাস তিনটিতে। অর্থাৎ ভারত ইতিহাসের ট্র্যাজেডির সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের ট্র্যাজেটির এক কুশলী মিশ্রণ ঘটেছে উপন্যাস তিনটিতে। 'জল পড়ে পাতা নড়ে' উপন্যাসটি ১৯২২ সালের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রচিত হচ্ছে। উপন্যাসটির একদিকে দেখানো হয়েছে কলকাতা কাউন্সিল নির্বাচনের প্রস্তুতি। অন্যদিকে দেখানো হয়েছে গ্রামীণ নিম্নবিত্ত পরিবারের প্রেম-ভালোবাসা-আশা-নিরাশা-ঘৃণা-দ্বেষ-আচার- সংস্কার এমনকি নিকটতম প্রতিবেশী মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন। গ্রামীণ একান্নবর্তী পরিবার গ্রামজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবিকার সন্ধানে শহরমুখি হতে শুরু করেছে। ১৯২২ সালে কাউন্সিল নির্বাচনকে ঘিরে মডারেট, স্বরাজ্যদল এবং নো-চেঞ্জারের মধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছিল পাঞ্জা-কষাকষি। তারই মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের দৃপ্ত ঘোষণা—

> আমরা কাউন্সিলে ঢুকছি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবার জন্য নয়, ভিতর থেকে গুঁতো মেরে ওদের শাসনতন্ত্র ভেঙে দেবার জন্য। [জলপড়ে পাতা নড়ে, পৃ. ১২১][১২]

সেই সঙ্গে কাউন্সল নির্বাচনকে ঘিরে কলকাতায় হয়েছে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সমঝতার রাজনীতি (হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট)

> ভোট হবে। বাবুরা কাউন্সিলে যাবেন। হিন্দুরা হিন্দুগেরে ভোট দেবে, মুসলমানরা দেবে মুসলমানগেরে। হিন্দু মোছলমানে একতা হয়ে যাবেন। এইসব নাকি সি আর দাস না কেডা, তিনার আজ্ঞে। [তদেব, পৃ. ৫৩][১৩]

চিত্তরঞ্জন দাশ কলকাতা কাউন্সিল নির্বাচন বন্ধের বিপক্ষে ছিলেন। তিনি কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গান্ধিজিকে বলেছিলেন—

> These (reforms) are not gifts to the British Government. Reforms have been wrung out of the hands of the British Government. I want to make the councils an instrument for the attainment Swaraj and to use the weapon which is in the hollow of your hands to bring about the full complete Swaraj. [আধুনিক ভারতের রূপান্তর, রাজ থেকে স্বরাজ (১৮৫৮-১৯৪৭) পৃ. ৪৮৫][১৪]

চিত্তরঞ্জন দাশ বুঝতে পেরেছিলেন যে, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ছাড়া ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশদের তাড়ানো সম্ভব নয়। ১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক ভ্রাতৃঘাতী সঘর্ষের আগে ১৯২২ সালে একবার হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ দানা বেধে উঠেছিল।

তার মধ্যে চিত্তরঞ্জন দাশের হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট ঘোষণা মুসলিমদের মধ্যে কিছুটা আশার আলো সঞ্চার করেছিল। তাই উপন্যাসে সফিকুল মেল্লাকে বলতে শোনা যায়—

> অ্যাদ্দিন পরে হিঁদুগের আক্কেলের গুড়ায় পানি পড়িছে। ভোট যদি সত্যিই আলাদা আলাদা হয়, মোছলেম জাহানের তাতে তরক্কিই হবে। চাকরিবাকরির সুবিধে আমাদের কিছু হতি পারে। [তদেব, পৃ. ৫৩][১৫]

সেই সময় বাংলায় সরকারি চাকুরের সংখ্যা ছিল তিন লক্ষ একুশ হাজার কি বাইশ হাজার (৩২১০০০-৩২২০০০) আর তখন বাংলার লোকসংখ্যা ছিল পাঁচ কোটি (৫ কোটি)। তার মধ্যে মুসলমান প্রায় পৌনে তিন কোটি, বাদ বাকি সব হিন্দু। এই পৌনে তিন কোটি মুসলমানদের যদি সবাইকে চাকুরি দেওয়াও হত, তাহলেও দু কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ মুসলমানের সমস্যা থেকে যেত। শুধু বাংলাই নয় সমগ্র ভারতের কম-বেশি সমস্ত জায়গারই প্রায় একই রকম চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। সেই সময় বাংলার মুসলমানরাই ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ। অন্যদিকে উপন্যাসে মেজোকর্তার মতো হিন্দুরা চিত্তরঞ্জনদাশের হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টের উপর আস্থা রাখতে পারছিলেন না। মেজকর্তার তা স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে—

> আমাদের আসল সমস্যা কি এই যে, কার ভাগে কটা চাকরি পড়বে? সমস্যা তার চেয়েও ঢের ঢের বেশি জটিল। এই পাঁচ কোটি লোকের জন্য কীভাবে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করা যায় তাই ভাবা, তার জন্যে ব্যবস্থা করা, তাই হল প্রকৃত সমস্যা। এখন বলো, সরকারি চাকরি ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিলেই কি দেশের তাবৎ লোককে দুধে-ভাতে রাখার ব্যবস্থা করা যাবে? দেশের আসল যা রোগ, দারিদ্র্য, তার চিকিৎসা না করে, কলকাতায় বসে কালনেমির লঙ্কা ভাগ হচ্ছে। কলকাতায় বসে ফতোয়া ঝাড়লে, তা সে যিনিই ঝাড়ুন, আমার ধারণা তাতে দেশের লোকের এক তিল উপকার হবে না। সে তুমি প্যাক্টই করো আর যাই করো। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৫৪][১৬]

সেই সময় কলকাতার পার্কে পার্কে সভা-সমিতির আয়োজন শুরু হয়ে গেছে। কাউন্সিল ইলেকশনকে ঘিরে মডারেট, স্বরাজ্যদল আর 'নো'-চেঞ্জারের' মধ্যে পাঞ্জা কষাকষি শুরু হয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে দেশবন্ধু, তাঁর নতুন সংগ্রাম-পদ্ধতির কথা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের উদ্দেশ্যে প্রচার করে চলেছেন—

> কাউন্সিলের ইলেকশন আর বর্জন নয়, এবারে গ্রহণ—কাউন্সিলে ঢুকে ইংরেজের কেশর ধরেই নাড়া দিতে হবে। ভারত শাসন আইন অকেজো করে দিতে হবে। তবেই ইংরেজদের তাড়াতে পারা যাবে। [সমগ্রন্থ, পৃ. ১২২][১৭]
>
> এরই মধ্যে—কংগ্রেসে দুটো দল হয়ে গেল। একদল নো-চেঞ্জার। তাঁরা অসহযোগের আদর্শ আঁকড়ে থাকলেন। দেশবন্ধু আর পণ্ডিত মতিলাল নেহরু আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। প্রতিষ্ঠা করলেন স্বরাজ্য পার্টি। নো-চেঞ্জাররা ধিক্কার দিতে লাগল দেশবন্ধুকে। মডারেট দল আগেই কাউন্সিলে ঢুকেছিল। মিনিস্টারি নিয়ে পরিষদীয় রাজনীতিতে হাত পাকাচ্ছিল। এবার মডারেটরা মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। কিন্তু হাসুক মডারেটরা, রটাক কুৎসা নো-চেঞ্জাররা, দেশবন্ধুকে ওরা এঁটে উঠতে পারবে না। জয় তাঁর হবেই। [সমগ্রন্থ, পৃ. ১২২-১২৩][১৮]

দেশবন্ধুর আহ্বানে হিন্দুরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিতে পারেনি তাদের মনে হয়েছেযে দেশের বেশির ভাগ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে। সেই সমস্ত মূক মূঢ় মানুষগুলোকে কীভাবে প্রাণসঞ্চার করবেন। কারণ দেশের পায়ে শিকল দিয়ে বাঁধা। কিন্তু সুধাময়ের মতো যুবকেরা মনে করে দেশের

> পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচন করতে পারলেই আমাদের সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে। দেশের প্রাণ আপনি জাগ্রত হবে। [সমগ্রন্থ, পৃ. ১২৩][১৯]

লেখক 'মেজোকর্তা' নামে এক চরিত্রের মধ্য দিয়ে বলতে চেয়েছেন যে, দেশোদ্ধার করা কখনও সহজ কাজ নয়, এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া। দেশের মানুষের উদ্ধার করা যায় কিন্তু দেশোদ্ধার নয়। কারণ দেশবাসীর মধ্যে শুধু মানুষই আছে। বিচিত্র সব মানুষ। কৃষক আছে, জমিদার আছে, শ্রমিক আছে। চাকুরে আছে, আবার কলকারখানার মালিক আছে। শোষিত আছে, শোষক আছে। শতরকমের অত্যাচার অবিচার আছে। আছে হিংসা, বিদ্বেষ, পরস্পরের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত। এ সমস্যা জড় মৃত্তিকার নয়, সজীব মানুষের। সমস্যা আছে হাজার রকম—আর্থিক, সাংস্কৃতিক দার্শনিক। বড়ো জটিল ব্যাপার। সম্ভবত এত জটিলতায় দিশেহারা হয়ে যাবার যে আমাদের থাকে। এত সব সমস্যার

চিন্তা মাথায় ঢুকলে বাক্যস্ফূর্তি না ঘটার আশঙ্কাই থাকে, তাই এই সব জটিলতার মূল অতি বাস্তব এই দেশবাসী শব্দটাকে উহ্য রেখে নিমগ্ন থাকে কাল্পনিক অন্যধ্যানের মন্ত্রে 'ত্বং হি দুর্গা।'

নো-চেঞ্জার দলের সদস্যরা চিত্তরঞ্জন দাশের বিরোধিতা করতে শুরু করে। সেই রকম রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথাও আছে উপন্যাসটিতে।

> দাশ সাহেব নাকি কর্পোরেশনের পলিটিক্সে নোংরামি ঢুকিয়েছেন। সেদিন কর্পোরেশনের সভায় তিনি যে অত বেশি ভোটে নিজের রেজলিউশনগুলো পাশ করিয়ে নিলেন, তা নাকি সেরেফ ধাপ্পা দিয়ে। বিরোধী পক্ষের কাউন্সিলারদের এক বাগানবাড়িতে নেমন্তন্ন করেছিলেন দাশ সাহেব। মদ আর মাগি সাপ্লাই করে দু'রাত দু'দিন তাদের আটকে রেখেছিলেন। ভোটের সময় তারা কেউ হাজির হতে পারেনি। [সমগ্রন্থ, পৃ. ১১৪][২০]

উপন্যাসটিতে লেখক ধরতে চেয়েছেন স্বদেশি, সন্ত্রাসবাদ, নন-কো-অপারেশন, সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স প্রভৃতি নানা নরম-গরম আন্দোলনের কথা। তবে তিনি বেশি জোর দিয়েছেন চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে কলকাতায় কাউন্সিল নির্বাচন। তাঁর নেতৃত্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও তাঁর মতাদর্শগত বিরোধ এবং শেষ পর্যন্ত স্বরাজ্য চুক্তির মতো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ। অখণ্ড বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বিশের দশকের গোড়ায় এই সংঘর্ষ আবার দানা বাধতে থাকে। সেই সম্পর্কে সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

> বিশের দশকের গোড়ায় অসহযোগ-খিলাফত আন্দোলনের সুবাদে হিন্দু-মুসলমানের যে সাময়িক মিলন, ভিত তার শক্ত ছিল না ; আর তাই আন্দোলনের অকাল পরিসমাপ্তির কয়েক বছরের মধ্যেই মসজিদের সামনে বাজনা বাজানো নিয়ে বিরোধ আর তা থেকে শোচনীয় দাঙ্গা ঘটে যায় কলকাতায় এবং পূর্ববঙ্গের কয়েকটি অঞ্চলে।
>
> বাঙলায় হিন্দু জমিদার বনাম মুসলমান চাষি ভূমি সম্পর্কের এই দ্বন্দ্বই নিঃসন্দেহে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের একটা বড় কারণ; তবে সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখানো হয়েছে, বিশের দশকের আগেই এই সমীকরণ বদলাতে শুরু করেছিল। বৈষম্য আরও বেশি ছিল শিক্ষা ও চাকরি সুযোগ-সুবিধায়, মধ্যবিত্ত স্বার্থে। তুলনায় অনগ্রসর মুসলমান সমাজের ভেতর থেকে এতদিনে উঠে এসেছে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী ; প্রখর হয়েছে তার আত্মমর্যাদার আর আত্মপ্রতিষ্ঠার চেতনা; দাঙ্গার রাজনীতিতেও এসে যাচ্ছে তার প্রতিফলন।
>
> মুসলমান মধ্যবিত্তের এই দাবিকে মর্যাদা দিয়ে বাঙলার প্রাদেশিক আইন পরিষদে তাদের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব দিতে চেয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ; বাধা দিয়েছিল হিন্দু কায়মো-স্বার্থ। [দাঙ্গা থেকে দেশভাগ ঃ ফিরে দেখা, ছেচল্লিশের দাঙ্গা, সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২১][২১]

অনগ্রসর মুসলমান সমাজের ভিতর থেকে গজিয়ে ওঠা মধ্যবিত্ত শ্রেণি নিজেদের দাবি-দাওয়া নিয়ে ধীরে ধীরে সোচ্চার হয়ে ওঠে। সেই রকমই একটি চরিত্র উপন্যাসে মেদ্দার সাহেব। উপন্যাসটিতে লেখক চরিত্রটির মধ্যদিয়ে তৎকালীন মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক মানসিকতাকে দেখাতে চেষ্টা করেছেন—স্কুল কমিটি বানানোর ব্যাপারে মেদ্দা সাহেব বলেন—"ইস্কুল কমিটির মেম্বর অর্ধেক হবে মুসলমান আর বাকি অর্ধেক হবে হিন্দু। আবার হিন্দুদের সংখ্যার ভিতর শিডিউল কাস্টও থাকা চাই।" [পৃ. ২২৬][২২]

রাজনৈতিক স্তরে মধ্যবিত্ত মুসলিম মানসিকতাকে চিত্তরঞ্জন দাশ অনুভব করতে পেরেছিলেন এবং তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন আগামীর রাজনৈতিক ভাঙা-গড়ার উত্তালময় পরিস্থিতিকে। স্বরাজ্য দল গঠিত হলে তিনি হন তার সভাপতি এবং মতিলাল নেহরু হলেন অন্যতম সম্পাদক। স্বরাজ্য দল কিন্তু গঠিত হয়েছিল কংগ্রেসের মধ্যেই। স্বরাজ দলের সঙ্গে কংগ্রেসের বড়ো ধরনের নীতিগত পার্থক্য ছিল না। চিত্তরঞ্জন দাশ সন্ত্রাসবাদের সাথে হাত মেলালেও তিনি সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। স্বরাজ্য দলের অপর দিকে ছিল রাজাজী দল। আর সেই দলের নেতা ছিলেন বল্লভ ভাই প্যাটেল ও রাজেন্দ্রপ্রসাদ। চিত্তরঞ্জন দাশ স্বরাজ্য চুক্তিতেও স্বাক্ষর করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের অন্যান্য হিন্দু নেতারা তা মেনে নিতে পারেননি।

সি আর দাশ নাকি স্বরাজ্য চুক্তিতে কবুল করেছেন, হিন্দু-মুসলমানের স্বতন্ত্রভাবে অধিকার আদায়ের হক আছে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের দাবি স্বীকার করেছেন ব্যারিস্টার নেতা সি আর দাশ। [সমগ্রন্থ, প. ২২৭][২৩]

তারা আরও বলেছিলেন—

দাশ সাহেব ইলেকশনের বৈতরণী পার হতে গিয়ে যে বিষবৃক্ষের চারায় সার জল ঢেলেছিলেন, এই দু'বছরে তার শিকড় কত দূর প্রসারিত হয়েছে! অ্যাঁ! দাশ সাহেবের মতো ব্যক্তিত্বকেও সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে আপস করতে হল! কী পেলেন তিনি? কাউন্সিলে একচ্ছত্র মেজরিটি। কীসের জন্য? দলবদ্ধভাবে গর্ভনরের কাউন্সিলে বাধা সৃষ্টির জন্য। [সমগ্রন্থ, পৃ. ২২৭][২৪]

হিন্দু সাধারণ মানুষ, কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ দেশবন্ধুর বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে সোচ্চার হতে শুরু করে, তারা নিজেদের মধ্যেই আলোচনা করতে থাকে।

এই দু'বছরে কী করলেন দেশবন্ধু? মন্ত্রীদের বেতন যাতে না বাড়ে, শুধু তাই নিয়ে হইচই। এর পরিবর্তে কী দিতে হল? সাম্প্রদায়িকতার বাঘের মুখে মাংসের টুকরো। যে আন্দোলন মানুষের মন থেকে এই হিংস্র বাঘকে চিরতরে তাড়িয়ে দিত, তেমন কোনও আন্দোলন গড়ে উঠল না কেন? না, তা হলে যে জনতার প্রিয় হওয়া যেত না। অনেক অপ্রীতিকর সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াতে হত যে। ভেলকি দেখানো যেত না। তাই কোনও নেতাই তো সেদিকে পা বাড়ালেন না। [তদেব, পৃ. ২২৭][২৫]

ধীরে ধীরে গ্রামগুলোতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে রেষারেষি প্রকাশ্য বিরোধিতায় এসে দাঁড়ায়।

মুসলমান-সমাজ নতুন প্রভু ইংরেজদের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। এখন দ্রুত সে দূরত্ব কমাতে তারা উঠে-পড়ে লেগেছে। হিন্দু-সমাজ পুরনো প্রভু মুসলমানদের বিকল্প বলেই ইংরাজদের কাছে সরে এসেছিল। তাদের ভালমন্দ দোষগুণ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনেকদিন ধরে আত্মসাৎ করেছে হিন্দু সমাজ। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, নিতান্ত চাকুরি নির্ভর এক মধ্যবিত্ত শ্রেণি সৃষ্টি হয়ে উঠেছে হিন্দু সমাজের মধ্যে। বিশেষ করে কেরানিদের জন্মভূমি এই বাংলাদেশে। কী অদ্ভুত এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বিপরীত ভাবধারার শত স্রোতে ভাষা। [পৃ. ২২৯][২৬]

এই সব নতুন সৃষ্টি হওয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে (হিন্দু-মুসলিম উভয়) ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থে তোষণ করতে লাগলেন। সমাজে মধ্যবিত্তের অবস্থানটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে মেজকর্তার কথার মধ্য দিয়ে—

শুধু একটা নতুন কুর্তা গায়ে চাপিয়ে পুরনো চেহারা ঢাকা দিয়েছি। ইংরেজের মারফত আমরা এই মধ্যবিত্তয়ানা পেয়েছি। যেন মেকেঞ্জি লায়ালের নিলামখানা থেকে কেনা পুরনো সোফা কৌচ দিয়ে মানসচেতনার চণ্ডীমণ্ডপটা সাজিয়েছি শুধু। তাই আমাদের ব্রাহ্মণত্ব ঘোচেনি, হিন্দুয়ানি যায়নি। এই প্রতিবেশী হিসেবে বাস করেও মুসলমানদের আমরা মানুষ বলে ভাবতে শিখিনি। এবার মুসলমান মধ্যবিত্ত হয়ে উঠছে। ইস্কুল কলেজে ইংরেজি বিদ্যায় হাতে খড়ি নিচ্ছে। আর তাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব যত না জাগছে, মুসলমানত্ব তার চেয়েও দারুণ বেগে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। উঠতির মুখে সদ্য লব্ধ সাম্রাজ্য হাতে রাখার জন্য ইংরেজ এককালে হিন্দু তোষণ শুরু করেছিল। এখন পড়তির মুখে এসে সেই সাম্রাজ্য কোনওমতে টিকিয়ে রাখবার জন্য সেই ইংরেজ আজ মহোৎসাহে মুসলমান তোয়াজ শুরু করেছে। স্বদেশ থেকে মানব-প্রেম, ন্যায় নিরপেক্ষতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে এসে ইংরেজ এদেশে, বিভেদ, বিদ্বেষ আর ঘৃণার বীজবপন করছে। অদৃষ্টের কী নিদারুণ পরিহাস। [পৃ. ২২৯][২৭]

ইংরেজদের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের তোষণনীতির কারণ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তিনি শুধুমাত্র বাংলার নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের দেশবন্ধু। কারণ ১৯২৫ সালে চিত্তরঞ্জন দাশের অকাল প্রয়াণের পর ভেঙে গেল হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে ঐক্যের সম্ভাবনা। কংগ্রেস ও লিগের মধ্যে সম্পর্ক ভেঙে গেল ১৯২৮ সালের শেষের দিকে। এই বিষয়ে সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় যে বিবরণ দিয়েছেন তা আমরা দেখে নিতে পারি—

১৯২৫-এ চিত্তরঞ্জনের অকাল প্রয়াণের পর সমাধি দেওয়া হল সেই চুক্তির সম্ভাবনাকে। কংগ্রেস-লিগের সম্পর্ক এরপর প্রায় ভেঙে পড়ল ১৯২৮ এর শেষে, মতিলাল নেহরু রিপোর্ট নিয়ে বিতর্কের সময়, যখন হিন্দু মহাসভার এবং কায়েমী হিন্দু স্বার্থের চাপে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে মুসলমানদের ৩৩ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব এবং বাংলা-পাঞ্জাবে তাদের জন্যে সংরক্ষিত আসনের দাবি নাকচ করে দিল কংগ্রেস। জিন্নাহ ঘোষণা করলেন, এই চুকে গেল কংগ্রেস-লিগের সম্পর্ক। এই দাবিগুলি মেনে নিলে স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর দাবিও ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন জিন্নাহ ; কিন্তু কায়েমী হিন্দু স্বার্থ তা মেনে নেয়নি। কংগ্রেস লিগ সমঝোতা ভেঙে পড়ে এর ফলে। ১৯২৯ এর মার্চে লিগ পেশ করে তার ১৪ দফা দাবি ; সে দাবিও কংগ্রেস স্বীকার করেনি। এরপর লিগ ব্রিটিশের কাছ থেকে স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর দাবি আদায় করে নিতে সক্ষম হয় ; সাম্প্রদায়িক বিভাজন একরকম আইনসিদ্ধ হয়ে যায় এর ফলে। [দাঙ্গা থেকে দেশভাগ ঃ ফিরে দেখা। ছেচল্লিশের দাঙ্গা।][২৮]

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পনেরো বছর আগে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিচ্ছেদের বীজ রোপণ করা হয়েছিল তা পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। বিচ্ছেদের রাজনীতি বহনকারী সময় ক্রমশ এগিয়ে চলে তার অভিমুখকে লক্ষ্য করে। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার জায়গা হল রাজনৈতিক মঞ্চ। তাদের তৈরি করা নীতির কলের পুতুল হল সাধারণ মানুষ। তারই প্রমাণ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে প্রাণ হারাতে হয়েছিল হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষকে। তার সাংখ্য প্রমাণ পাওয়া যাবে ইতিহাসের দলিল দস্তাবেজের মধ্যে। আমরা 'জল পড়ে পাতা নড়ে' উপন্যাসটির মধ্যে দেখতে পেলাম দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং হিন্দু-মুসলমানদের সম্পর্কে তাঁর ভাবনা-চিন্তা। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ঘটে নানা ধরনের সেই পরিবর্তনের ছাপ আমরা দেখতে পাব 'প্রেম নেই' উপন্যাসটির মধ্যে।

'প্রেম নেই' উপন্যাসে ধরা পড়েছে মুসলিম জীবনের ছবি, এর আগে বিভিন্ন সাহিত্যকর্মে মুসলিম জীবন সেইভাবে প্রাধান্য পায়নি। এক কথায় বলা যেতে পারে সাহিত্যকর্মে মুসলিম জীবন অবহেলিত হয়েছে। সময়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে বাস্তব ও যুক্তিসম্মতভাবে মুসলিম জীবনের স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবি তুলে ধরার প্রয়াস লক্ষ করা যায় তাঁর প্রেম নেই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। লেখকের এই প্রয়াসের আরেকটি লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়, ম্যাগসেসে পুরস্কার ঘোষিত হওয়ার দিন তিনি ছিলেন বাঙালি মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনের প্রধান অতিথি হিসেবে। 'প্রেম নেই' উপন্যাসের সুবিস্তৃত ক্যানভাস জুড়ে লেখক মুসলমান জীবনের এক সুবিশাল অন্তরঙ্গ আলেখ্য রচনা করেছেন। 'প্রেম নেই' উপন্যাস পড়তে পড়তে পাঠকের মনে হবে, লেখক বুঝি 'সফিকুল' বা 'দাউদের' আবাল্য সহচর। তিনি ঘনিষ্ঠভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন তাদের সংস্কার ও সংঘাত, জ্বালা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব, প্রেম ও রিরংসা, ধর্ম ও রাজনৈতিক চেতনাকে। তিনি গ্রাম ও শহরের জীবনযাত্রাকেও প্রত্যক্ষ করেছেন এবং গ্রাম ও শহরের মানুষকে করে তুলেছেন একে অপরের প্রতিবেশী। উপন্যাসটির নামকরণের মধ্য দিয়ে লেখকের গভীর মনস্তত্ত্ব ধরা পড়েছে। হিন্দু ও মুসলমান, গ্রাম ও শহরের মানুষ, নারী ও পুরুষের মধ্যে চিরকালীন শাশ্বত প্রেম ছিল বলেই তিনি সমকালীন প্রেক্ষাপটে লিখলেন 'প্রেম নেই' উপন্যাসটি। কারণ লেখকের মনে হয়েছে, চিরাচরিত প্রেমে কোথাও হয়তো ভাঙন ধরতে শুরু করেছে। লেখকের সেই ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে উপন্যাসের ফটিক চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। উপন্যাসটিতে 'গয়া' চরিত্রটিকে বলতে শোনা যায়—

> মোছলমান হলিই বুঝি সব ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির হয়ে যায়। আরে ঐ খাদু, আমার বাপের তো ছেরাদ্দ করে ছাড়লি। হিঁদু ফিঁদু কত কী বললি। শালা আমি ছোট জাত, তুই মোছলমান। হিন্দু সমাজ তো বাবুগের সমাজ। ওগের কাছে তুইও যা আমিউ তাই। বরং বাবুগের সমাজ তোগের যদিও পাত্তা দ্যায়, আমাগের তাউ দেবে না। হিন্দু! হিন্দু তো খালি বাবুরা। ঐ বামুন কায়েত বদ্যি আর বদ্যি কায়েত বামুন। এর নিচে যে শালারা তারা হাতে পয়সা হলিই বামুন খাওয়ায় আর পৈতে নিয়ে বাবু হয়ে যায়। [পৃ. ১৬১][২৯]

উপরিউক্ত চিত্রটিই ছিল তৎকালীন সময়ের বেশিরভাগ গ্রাম-সমাজের বাস্তব চিত্র। তৎকালীন সময়ে সমাজে হিন্দু-মুসলমান প্রায় সকলেই নিজের নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত ছিল, তা সাজ্জাদের কথায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তুমরা কী যে সব হিন্দু হিন্দু মুছলমান মুছলমান কর আমি কিছু বুঝিনে। লাভের কড়ি ট্যাকে গুঁজার বেলা মেদ্দা কি বিশ্বেস, কুণ্ডুকি মাড়োবাবুর চাইতি কম কিছু করে? না মেদ্দা চশমখোর কারুর চাইতি কম? মেদ্দা কি কুষ্ঠার দাম অন্য কারুর থে আমরা মুছলমান চাষী বলে আমাগের বেশি করে দ্যায়? তবে? হিন্দু বলো মুছলমান বলো নিজির কোলে ঝোল টানার ব্যাপারে কিডা যে কার চাইতি কম, তাই তো বুঝিনে? [পৃ. ১৬৩][৩০]

অর্থাৎ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরাধীনতা জন্ম দিয়েছে অর্থনৈতিক শোষণের এবং দারিদ্র্যের। যার থেকে মুক্তি পাওয়া ছিল অসম্ভব। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের জন্য দায়ী। এই অবস্থায় মানবীয় সত্তার মুক্তি অসম্ভব ছিল। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া সমাজে আধ্যাত্মিক প্রগতি একেবারেই সম্ভব নয়। আর রাজনৈতিক স্বাধীনতার ফল যদি সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে আর সাধারণ মানুষের অবস্থা আগেও যা ছিল পরেও যদি তাই থাকে, তবে সেই স্বাধীনতা কখনোই কাম্য নয়। গান্ধিজি এই স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিলেন। তাই তাঁর সংগ্রাম ছিল 'ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে, ইংরেজ জাতির বিরুদ্ধে নয়।' গান্ধিজির নীতির পূর্বাভাষ লক্ষ করা গিয়েছিল চিত্তরঞ্জন দাশের একটি ভাষণে। তিনি ইংল্যান্ডে পড়তে গিয়ে প্রকাশ্য সভায় বলেছিলেন—

Gentlemen, I was sorry to find it given expression to in Parliamentary speeches on more than one occasion that England conquered India by the sword and by the sword must she keep it ! England, gentlemen did not such thing ; it was not her swords and bayonets that won for her this vast and glorious empire, it was not her military valour that achieved this triumph, it was in the main a moral victory or a moral triumph. England might well be proud of it. But to attribute all this to the sword and than to argue that the policy of sword is the only policy that ought to be pursued in India is to my mind absolutely base, and quite unworthy of an Englishman." [জল পড়ে পাতা নড়ে,পৃ. ২৪৭][৩১]

তিনি বলেছিলেন ইংল্যান্ড ভারতকে তরোয়ালে জোরে নয়, বেয়নেটের জোরে নয়, জয় করেছে নৈতিক শক্তির জোরে। তাই ভারতকে তরোয়ালের জোরে দাবিয়ে রাখার কথা ইংরেজের মুখে শোভা পায় না। [জল পড়ে পাতা নড়ে, পৃ. ২৪৭][৩২]

সমাজে শুধুমাত্র হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেই শুধুমাত্র বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে তাই নয়, এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেও জমিদার-মহাজন ও খেটে খাওয়া কৃষক-শ্রমিক ও মজুর শ্রেণির মধ্যে। তাই প্রেম নেই উপন্যাসে বশিরকে বলতে শোনা যায়—

জোট বাঁধো জোট বাঁধো। হিন্দু মুসলমান সব চাষী যদি একসাথে জোট বাঁধতি পারো, তবেই গিয়ে সুমুন্দিরা জব্দ হবে। [পৃ. ১৬২][৩৩]

ধীরে ধীরে মুসলমানসমাজের মধ্যে হতাশা ও সাম্প্রদায়িকতা বোধ গ্রাস করতে থাকে। সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের অবনতির জন্য হিন্দু-মুসলিম উভয় পক্ষই দায়ী ছিল। কারণ উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল, তাকে মূলধন করে উভয় সম্প্রদায় বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। 'বশিরে'র বাজানের কথায় তা প্রকাশিত হয়েছে—

বাংলাদেশে রোজ গড়ে তিন শতাধিক মুসলমান দায়ীকের সম্পত্তি নীলামে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। আর তা কিনে নেবার ক্ষমতা কোনও মুসলমানের হচ্ছে না। মুসলমানগের সম্পত্তি সব চলে যাচ্ছে অমুসলমানগের হাতে। রোজ তিন শতর উপর মুসলমানের সম্পত্তি এই বাংলায় নীলামে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। ভাবতি পারো? এ হিসেব আজকের নয়, বশির। অন্তত পনের ষোল বছর আগেকার কথা। আজ জমি বিক্রির সংখ্যা তো আরউ বাড়িছে। আর ক বছর পরে আমাগের থাকবে কী? কতি পারো? [পৃ. ১৬৬][৩৪]

বাজানের কথায় বশির ধীরে ধীরে মুসলমান সম্প্রদায়ের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষগুলোর জন্য বিপন্ন বোধ করতে লাগল।

মহাজনরা এ রকম অন্যায় নতুন করছে না। এক যদি ওদের দ্বারস্থ হতে না হত তবে হয়ত উপায় করা যেত। আরেকটা উপায় করা যেত। গ্রামের চাষীদের ঋণ দেবার জন্য প্রতি গ্রামে একটা করে বয়তুলমাল অর্থাৎ কি না নিজেদের মধ্যে টাকা তুলে একটা তহবিল আর তিন চারটে গ্রাম নিয়ে একটা ধর্মগোলা যদি গড়ে তোলা যায় তা হলে চাষীদের আর ঋণ নেবার জন্য মহাজনদের কাছে হাত পাততে হয় না। কিন্তু মুসলমান চাষীরা এতই বোকা এবং অবিশ্বাসী এবং পরনির্ভর এবং নিরুপায় যে আবু তালেবের এই সব ভালো মতলবে এরা কানই দিতে চায় না। একে অন্যকে বিশ্বাসই করতে চায় না। মহাজনদের কাছে জুজু হয়ে থাকে। পাছে মহাজন নারাজ হয়। [পৃ. ১৬৭][৩৫]

মুসলমান সমাজের মাতব্বরেরাই মসজিদির সম্পত্তি, ওয়াকফ সম্পত্তি একের পর এক গাপ করে দিতে থাকে। অন্যদিকে কৃষিঋণের পাহাড়ের তলায় বাংলার সব চাষিই পুরুষানুক্রমে চাপা পড়ে আছে। এক্ষেত্রে উপন্যাসে জমিরুদ্দিনের কথাটি বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য—

জমির জানে যে বড় বড় লোকেদের সঙ্গে টক্কর দিতে গিয়ে আখেরে গরিবের কোনও লাভ হয় না। ওদের ইজ্জত, মালকড়ি, তদ্বির তদারকের ঘোরে ওরা বেরিয়ে যাবে। যাবেই, যারা সমাজের মাথা তারা সব সময়ই রেহাই পেয়ে যাবে। কিন্তু গরিব যে তাকে বাঁচাবার জন্য কেউ এগিয়ে আসে না। ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক, দোষে হোক, কি বিনা দোষে হোক, গরিব যদি কোনও হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ে তবে তার আর নিস্তার নেই। একের পর এক ঝামেলা তার উপর এসে পড়বে। পড়বেই তার জমি যাবে, গরু মোষ যাবে। তারই আবার জেল ফাটক হবে। [পৃ. ১৮১][৩৬]

বাংলা তথা ভারতে সাম্প্রদায়িক বিভেদকে মূলধন করে মৌলবি ও ইংরেজরা ভারতের ঐক্যে আঘাত হানতে ও স্বাধীনতা সংগ্রামের গতিকে রুদ্ধ করতে তৎপর হলেন। বিশ শতকের তিরিশের দশকে বাংলায় কৃষক এবং খাতকের মধ্যে মুসলমানরাই সংখ্যায় বেশি ছিল। উপন্যাসটিতে লেখক যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন সেটি হল এইরূপ—

একশত বৎসরে মুসলমানগের হাতের যে দশ হাজারের বেশি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জমিদারী, ৫০ হাজার তালুক, ৩ লক্ষ ১৫ হাজার জোত, ৫৩ হাজার লাখের রাজ ও জায়গীর হিন্দুগের হাতে চলে গেছে আর নগদ টাকা গেছে ৬০০ কোটি ১৫ লক্ষ ৪২ হাজার। [পৃ. ১৮২][৩৭]

এই পরিসংখ্যানকে কাজে লাগিয়ে আবু তালেবের মতো মৌলবিরা সাধারণ মুসলানদের মধ্যে হিন্দু বিদ্বেষী মনেভাবকে তীব্রভাবে নাড়িয়ে দিতে চায়। তাই মুসলিম চাষি ও খাতকদের জমায়েতে মৌলবি আবু তালেব বলেন—

দেশের পর দেশ, জাতির পর জাতি উন্নতির পথে ছুটিয়া চলিয়াছে, বঙ্গের মুসলমান! কেবল তোমরা কেন পিছনে পড়িয়া? ....ব্রাতঃ, উঠ, একবার চক্ষু মেলিয়া দেখ দেখি, আজ হিন্দু সকল স্থানেই প্রধান, মুসলমান সকল স্থানেই গোলাম। আজ তোমাদিগকে দেখিয়া ছুরা আলার আয়াতিটিই কেবল মনে পড়ে। যিনি সবুজ তৃণ উদ্‌গত করিয়াছেন, তৎপর উহাকে শুষ্ক, মলিন করিয়াছেন। হায় বঙ্গের মুসলমান!তোমার ভাগ্য গুণে আল্লাহ পাক তোমাকে সবুজ তৃণরাজি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আর আজ তুমি নিজ কর্ম দোষে শুষ্ক, মলিন হইয়া গিয়াছ। [পৃ. ১৮২][৩৮]

তিনি আরো বলেন—

যে-বঙ্গে তিন কোটি মুসলমানের বাস, এক বঙ্গদেশে যত মুসলমান, পৃথিবীর বিধর্মী শূন্য কোনও মুসলমান শাসিত দেশেও তত মুসলমান নাই, তবু কেন, তবু কেন এই বঙ্গদেশেই আমাদের অধঃপতন চরমে পৌঁছিয়াছে? ভ্রাতঃ একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখ, একই বঙ্গের, একই অবস্থাপন্ন হিন্দু মুসলমানের কার্যের সমালোচনা করিলে হৃদয় বুঝিতে পারে মুসলমান কত অলস, কত কর্মবিমুখ! আজ হিন্দুদের শত শত কাজ নির্বিঘ্নে সমাধা হইতেছে আর মুসলমানের কিছুই হইতেছে না এজন্য আমরা হিন্দুকে বেশী দোষ দিতে পারি না। কারণ নিজের বলবীর্যের উপর আমাদের আত্মনির্ভরতা নেই। আমরা জাতীয় জীবন ও জাতীয় একতা হারা। অথচ সম্মান

পাইবার অভিলাষী। হিন্দুদিগের বর্তমান কার্যকলাপ আমাদের অনুমোদিত না হইলেও তাঁহদের অনেকের অধ্যবসায় স্বজাতিপ্রীতি স্বদেশভক্তি, স্বার্থত্যাগ ইত্যাদি গুণাবলী আমাদের অনুকরণীয়। তাহাদের একদল লোকের বেয়াদবি, বাচালতা, মিথ্যাবাদিতা, ভণ্ডামি, পরজাতি বিদ্বেষ, কুটিলতা প্রভৃতি দোষগুলি অবশ্যই বর্জনীয়।....হিন্দু নেতাগণ যেরূপ কঠোর উদ্যম ও যত্ন সহকারে চেতনা সঞ্চারের জন্য সর্বত্র বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছেন, স্বদেশী শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে চেষ্টা করিতেছেন, যদি মুসলমান সমাজের অগ্রণীগণ ইহার ষোলভাগের এক ভাগ, এমন কি শতভাগের এক ভাগ করিতেন, তবে বঙ্গীয় মুসলমানদিগের মধ্যে যুগান্তর উপস্থিত হইত। ভাই মুসলমান! আইস, আজ একই কেন্দ্রে আমরা একত্রিত হই, একই মন্ত্রে আমরা দীক্ষিত হই। ভাই ধর্মপ্রাণ মুসলমান, ভাই সমাজপ্রাণ পুরুষ, ভাই স্বজাতি হিতচিকীর্ষু আইস, আজ এসময়ে মায়ের সেবা করিয়া প্রকৃত সন্তানের কাজ করি। [পৃ. ১৮৩][৩৯]

ধীরে ধীরে গ্রামের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মধ্যে বিভেদের রেখা ক্রমশ বাড়তে লাগল। গ্রামে গ্রামে হিন্দু-মুসলিমদের আলাদা আলাদা রাজনৈতিক দল গড়ে উঠতে লাগল। হিন্দু মুসলমানদের দল ছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত দলও গড়ে উঠতে দেখা গেছে।

তোগের হল মোছম্মানের দল, গোমস্তাগের হল হিঁদুর দল, কাশেপাড়ার পিদ্রু বিশ্বেসের হল গে খেরেস্তানের দল, সবাই যদি এইভাবেই দল গড়তি থাকে, তাহলি মানুষগের দল হবে কোন্‌টা? [সমগ্রন্থ, পৃ. ২১৪][৪০]

বাংলার গ্রামে-গঞ্জের হিন্দুরা বুঝে গিয়েছিল যে,তাদের সঙ্গে মুসলমানদের মিশ খাওয়া সম্ভব নয়। কারণ তারা সম্পূর্ণ আলাদা জাত। হিন্দুরা জন্মগ্রহণ করেছে হিন্দুস্থানে, আর মুসলমানদের আসল দেশ হল আরব। সেই সঙ্গে গ্রামে গ্রামে যখন বাসের রাস্তা তৈরি হতে শুরু করে, তখন থেকেই 'আপনা-আপনিই হিন্দু মুসলমান রাস্তার এপারে ওপারে ভাগ হয়ে যায়।' [পৃ. ২১৪][৪১] সেই সাথে গ্রামগুলো ভাগ হতে শুরু করে 'অ্যাকটা হবে শুধু হিঁদুগের গিরাম আর অ্যাকটা হবে শুধু মুসলমানগের গিরাম?' [পৃ. ২১৭][৪২] হিন্দু-মুসলিম প্রজা আন্দোলন ধীরে ধীরে হয়ে দাঁড়ায় মুসলমানদের আন্দোলন। জমিদার মহাজনদের খয়ের খাঁরা হিন্দু প্রজাদের বলে বেড়াতে লাগল। এই আন্দোলন হল হিন্দুদের জাত মারার ফন্দী। ফলে দিন দিন অমুসলমান চাষিরা সরে যেতে লাগল কৃষক প্রজা আন্দোলন থেকে। অন্যদিকে দেশের বৃহত্তর রাজনীতিতে ভাঙা-গড়ার পর্ব চলছে। ১৯৩০ দশকের গোড়ার দিকে কংগ্রেসের বামপন্থী মতাদর্শ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তখন কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী মতাদর্শের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন জওহরলাল নেহরু। তিনি ধনতন্ত্রের বিনাশ ও সমাজতন্ত্রের বিকাশের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। গান্ধিজির সঙ্গে তাঁর মতাদর্শগত বিভেদ তীব্র আকার ধারণ করে। তিনি চেয়েছিলেন শ্রমিক ও কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মাধ্যমে জমিদারশ্রেণি ও পুঁজিপতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তুলতে, কারণ তিনি মনে করতেন শ্রেণি সংগ্রাম ছাড়া সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন অর্থহীন ও নিষ্ফল। নেহরুর এই মতাদর্শের মধ্যে মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্র মতবাদের প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় অন্যদিকে গান্ধিজি শ্রেণি সংগ্রামে বিশ্বাসী ছিলেন না। আর এখানেই গান্ধিজির সঙ্গে নেহরুর মতাদর্শগত বিভেদ তৈরি হয়েছিল। উপন্যাসটিতে লেখক দেখিয়েছেন হিন্দু মুসলিম কৃষক প্রজা পার্টির মুসলিম নেতারা বলে বেড়িয়েছেন—

আমরা কংগ্রেসী বাবুদের দরজায় গিছি, যে সব বাবুর কাউনসিলি যায়ে সাহেবগেরে উল্টোয়ে দিতি চান তাগের কাছেউ গিছি, আবার যারা বোমা ছোঁড়েন তাগের কাছেউ গিছি। যাইনি কার কাছে? চাষী যে মরে গ্যালো, খাতক যে ফৌত হয়ে গ্যালো। বাঁচান, এগের দিকি নজর দ্যান। দেশ তো এখেনে। একথা কইনি কারে? কিন্তু আফসোস, এই ডাকে আমরা হিঁদু নেতাগের সাড়া পাইনি। আফসোস চাষী খাতকের বাঁচাবার আন্দোলনে, প্রজাআন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে হিঁদু নেতারা আগোয়ে আইছেন। তাই আন্দোলনের চিহারাউ এইরকম হইছে। [পৃ. ২১৯][৪৩]

ধীরে ধীরে শিক্ষিত মুসলিম তরুণেরা রাজনীতির ক্ষেত্রে দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেল। বেশির ভাগ তরুণেরা মুসলিম লিগে যোগদান করল। আর ফটিকের (শফিকুল) মতো কিছু তরুণেরা যোগদান করেছিল জাতীয় কংগ্রেসে। লেখক তার বর্ণনা দিয়েছেন 'প্রেম নেই' উপন্যাসটিতে।

রাজনীতির স্তরে নবীন এবং তরুণ শিক্ষিত মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবোধের একটা প্রবল জোয়ার আসছে।....বাংলাদেশের সব শিক্ষিত মুসলমানেরই কি এই স্পিরিট নয় আজ? মাত্রাভেদ হয়ত আছে। চিন্তার স্তরভেদও হয়ত আছে কিন্তু মুসলমানকে আজ যদি বাঁচতে হয়, তার প্রতি অনুষ্ঠিত দীর্ঘদিনের অবিচার, অনাচার অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতিকার যদি করতে হয়, তার হক যদি আদায় করতে হয় তবে তাকে মুসলমান হয়েই তা করতে হবে, নান্য পন্থা; বিদ্যতে, এই ধারণাটি আজ শিক্ষিত এবং নতুন গজিয়ে ওঠা মধ্যবিত্ত মুসলমানের মনে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। যাঁরা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন তাঁরাও দেখি দ্বিধাদ্বন্দ্ব পরিহার করে পুরোপুরি মুসলমান হবার কাতারে গিয়ে দাঁড়াতে উদ্যত হয়ে উঠেছেন। অনেকেই বিশেষ করে যাঁরা দুপুরুষে শিক্ষিত এবং পেশাগতভাবে সফলতা অর্জন করেছেন অর্থাৎ বিত্তশালী হয়ে উঠেছেন.... [পৃ. ২২৫][৪৪]

১৯৩৫ সালে ২ আগস্ট ভারত শাসন আইন (গভরমেন্ট অব্ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট) অনুমোদিত হয়। ইয়াকুবের মতো ছাত্ররা ভেবেছিল এই আইনের মাধ্যমে ইংরেজ সরকার মুসলিমদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবে। মুসলিম ভোটারদের সংখ্যা বেড়ে যাবে। নতুন হিন্দু ভোটারের সংখ্যা যদি হয় তিন, তাহলে মুসলমান ভোটারের সংখ্যা হবে চার। ইয়াকুব বলেছিল—'অ্যাখন মুসলমানগের মুখি অ্যাকটাই নারা হওয়া উচিত, ভাই মুসলমান অ্যাক হও।' [পৃ. ২০৬][৪৫] কিন্তু এই ভারত শাসন আইন জিন্না সহ কোনো ভারতীয় নেতাকেই সন্তুষ্ট করতে পারেনি। এই সময় হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনতি ঘটলেও, তা পুরোপুরি বিচ্ছিন্নতাবাদের রূপ নেয়নি কারণ তখনও মুসলমানদের মধ্যেও একতা তৈরি হয়নি। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনকে নেহরু বলেছিলেন ''দাসত্বের দলিল''। অন্যদিকে জিন্না সহ মুসলিম লিগের অন্যান্য নেতারা এই আইনের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, এই আইনের দ্বারা কেন্দ্রে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

১৯২৯-৩০ সালের বেঙ্গল প্রভিনসিয়াল ব্যাংকিং এন্‌কোয়ারি কমিটির রির্পোট অনুযায়ী 'বাংলাদেশের চাষীর উদ্বৃত্ত থাকে মাথাপিছু বছরে ছয় টাকা।' [প. ২৫৪][৪৬] কিন্তু মুসলিম প্রজাপার্টির নেতা আবু তালেব বলে, 'আসলে উদ্বৃত্ত কিছুই নেই। আছে ঋণ ক্যাবল ঋণের বোঝা।' [পৃ. ২৫৪][৪৭] ১৯৩৫ সাল নাগাদ বাংলাদশে সেই কৃষি ঋণের পরিমাণ বেড়ে দাড়িয়েছে দুই শত দশ কোটি টাকা—এর উপর আছে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের বোঝা। আবু তালেব বলে—''বংলার চাষী যে, আজও বেঁচে আছে, এইটেই আশ্চর্য!'' [পৃ. ২৫৫][৪৮] আর তার মতো মুসলিম নেতাদের মতে, দেনার বেশির ভাগটাই চেপেছে মুসলমানদের ঘাড়ে। কেন না বাংলার মুসলিম চাষির সংখ্যাই বেশি অন্যদিকে ফটিকের মতো শিক্ষিত যুবকের মাথায়ও ঘুরতে থাকে চাষিদের রক্ত জল করা পরিশ্রমের বিনিয়ে দশ কোটি টাকা ঋণ। অপরদিকে কোনো বিনিয়োগ না করে বাংলার জমিদারের নীট আয় বছরে দশ কোটি টাকা। এই সমস্ত কৃষকদের কথা বাংলার কংগ্রেস নেতৃত্ব ভাবতে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। তারা নিজেদের সুযোগ সুবিধের কথাই বেশি করে ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করেছিল। বাংলায় কংগ্রেস নেতৃত্ব ভাবতে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। তারা নিজেদের সুযোগ সুবিধের কথাই বেশি করে ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করেছিল। বাংলায় কংগ্রেস অন্য দলের সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করতে অস্বীকৃত হওয়ায় ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা দল মুসলিম লিগের সঙ্গে মন্ত্রী সভা গঠন করে। এরই মধ্যে ''বর্তমান বেঙ্গল কাউনসিলির' আয়ু ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মার্চ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে গভরনরের পরিষদে জিন্নার লিগের দলের সমর্থকই বেশি ছিল। তাই হক সাহেব চেয়েছিলেন বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন করতে।

(ক) জমি হস্তান্তরের সময় জমিদারদের জমি কেনার অগ্রাধিকার রোধ করতে হবে।

(খ) নজরানা ও সেলামি প্রথার উচ্ছেদ করতে হবে।

(গ) জমিদারদের খাজনা বৃদ্ধির ক্ষমতা লোপ করতে হবে। হক সাহেবের সংগ্রাম ছিল বাংলার জমিদার, পুঁজিপতি কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে। সেই সম্বন্ধে যে খবর প্রকাশিত হয়েছিল তৎকালীন ''অমৃতবাজার'' পত্রিকায় তার খবরও লেখক উপন্যাসটিতে দেখিয়েছেন—হকসাহেব বলেছিলেন—

মাই ফাইট্ ইজ্ উইথ ল্যানডলরডস, ক্যাপিটালিসটস্, ল্যাণ্ড হোলডারস অব ভেসটেড ইনটারেসটস। জমিদার পুঁজিপতি এবং কায়েমী স্বার্থের রক্ষকদের বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম। দি ল্যানডলরডস আর নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট হিন্দুজ অ্যানড ক্যাপিটালিসটস অ্যানড আদারস আদার নাইনটি এইট পারসেনট হিন্দুজ। জমিদার শ্রেণীর শতকরা ৯৫ শতাংশই হিন্দু এবং ধনী মহাজনদের শতকরা ৯৮ জনই হিন্দু। সাহায্য দিয়া তো দূরির কথা, তাঁরা আমার পথে সব রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার জন্যি কোমর বাঁধে বেরোয়ে পড়িছেন। আমি বরং আশঙ্কা করি যে অদূর ভবিষ্যতে এই শ্রেণীর বিত্তশালী হিন্দুরা মুসলমান জমিদার, পুঁজপতি ও অন্যান্য ধনী মুসলমানদের সঙ্গে হাত মিলোয়ে আমাকেই কুপোকাত করার চিস্টা করবে। অল ইনডিয়া লেভেলে কংগ্রেসে আর মুসলিম লিগের মধ্যি যে নির্বাচনী সমঝোতা হইছে, সিডা কি প্রমাণ করে না যে, হক সাহেবের কথা যোল আনা সত্যি? [পৃ. ৩১১][৪১]

অন্যদিকে কৃষক প্রজা পার্টির নেতা মৌলবি আবু তালেব বলেছিলেন—

বাংলা দেশের মুসলিম লিগ পারলামেনটারি বোরডের যারা মেম্বার আছেন তাঁরা বাংলাদেশেরউ কেউ না আর বাংলার গরিব চাষী খাতকেরউ কেউ না। কারণ, এই বোরডের আটাশজন মেম্বারের মধ্যি এগারোজন হলেন অবাঙালী। যাগের কারউ বাড়ি ইসপাহান, কারউ বাড়ি তেহরান, আবার কারউ বাড়ি বাদাকসান, সমরকন্দ কিংবা বোমবাই, করাচি, উত্তরপ্রদেশ, আার ইডাউ বুঝে দ্যাখেন, ইরা কারা? বোরডের মেমবারগের শতকরা ঊননব্বুইজনই হলেন জমিদার ও ধনী সম্প্রদায়ের লোক। তালি কার স্বার্থ উনারা হেফাজত কতিছেন। কন? চাষীগের, খাতকগের, গরিবির না জমিদার বড়লোকের? বড়লোকের, ধনীর, জমিদারের—এগেরই স্বার্থ উনারা রক্ষে কত্তিছেন এবং করবেন। সেই জন্যই কৃষক প্রজা পারটির কর্মসূচী কি দাবি, ওগের প্রোগ্রাম কিংবা দাবি হতি পারে না। কারণ আমাগের দাবি যে উনাগেরই স্বার্থের বিরুদ্ধে। [পৃ. ৩১১][৫০]

কারণ, লিগ বাংলাদেশে মুসলমানদের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয় এবং লিগের কোনও অর্থনৈতিক কর্মসূচিও নেই। লিগের নেতৃত্বে কলকাতার কয়েকজন অবাঙালি শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী এবং বাংলাদেশের জমিদার ও ইংরেজ সরকারের খয়ের খাঁ নবাব নাইট স্যার আর খান বাহাদুর খান সাহেবের মুঠোর মধ্যে। তাই লিগ বাংলার গরিব মুসলমান কৃষক প্রজার বা মধ্যবিত্তের স্বার্থ রক্ষা করতে পারে না। সেক্ষেত্রে বাংলার চাষি খাতক, শ্রমিক ও গরিব চাকুরিজীবী ও ছোট ব্যবসায়ীরা লিগকে এবং তার ক্যানডিডেটকে তাদের প্রতিনিধি বলে মানতে পারা যাবে না। শুধু মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিক্ষিত এবং সুবিধাভোগী মুসলমানদের নিজেদের স্বার্থ রক্ষার কথা ভাবা হয়েছে। তাদের স্বার্থ শুধু চাকরি এবং পলিটিক্যাল ক্ষমতার হিস্যার কথা ভেবে নেওয়া। সেখানে ফটিক (শফিকুল)-এর মতো যুব সমাজ ভেবেছে—

যেখানে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে শতকরা আশি নব্বুই জনেরই হাঁড়ি চড়ে না,যাদের পরনে ট্যানা জোটে না এবং যারা ভুগছে নানাবিধ রোগে, এদের জন্য কোনও ব্যবস্থা হবে না। শুধু মুসলিম ইউনিটির ধুয়ো তুললেই মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা হবে। নিতান্তই যুক্তিহীন কথা এটা। [পৃ. ২৭৭][৫১]

এক সময় মুসলমানেরা স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবি তুলেছিল। সেই সময় হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক সমস্যাগুলি সমাধান করার একটা চেষ্টা নেহরু কমিটি করছিল বলে জানানোহয়। সেই সময় কংগ্রেসের হিন্দু নেতাদের পক্ষ থেকে বলা হয় মুসলমানরা যেন স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবি পরিত্যাগ করে, এবং তা আপস নিষ্পত্তির আলোচনার শুরুতেই মুসলমানেরা একথা স্বীকার করে নেয়। কারণ স্বতন্ত্র নির্বাচনের প্রস্তাব মেনে নেওয়া মানে, এক সম্প্রদায়ের প্রতি অন্য সম্প্রদায়ের প্রেম ও আস্থার অভাব তো স্বীকার করে নেওয়া। নেহরু কমিটির শর্ত শেষ পর্যন্ত মি. জিন্না, মওলানা মোহম্মদ আলী, মওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ নেতারা। মিশ্র নির্বাচন বা যুক্ত নির্বাচন স্বীকার করে নেবার পর এই মুসলিম নেতা বলেছিলেন—

যদি প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রকেই ভোটাধিকার দানের কথা হয়, তাহলে আমাদের আর কোনও কথা নেই। কিন্তু কোনও কারণে তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে শুধু বাংলা আর পাঞ্জাবের মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আসন

সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু কংগ্রেসী নেতারা এতে ঘোর আপত্তি তুললেন। তাঁদের বক্তব্য, আসন সংরক্ষণের দাবির ভিতর, এমন কি তা নির্দিষ্টকালের জন্য হলেও, স্বতন্ত্র নির্বাচনের বিষধর বীজাণুগুলি সমানভাবে লুকিয়ে আছে। সুতরাং জাতীয়তার উচ্চ ও মহান আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁরা মুসলানদের এই প্রস্তাবটাকে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হচ্ছেন। কংগ্রেস সাময়িক সুবিধার জন্য তো আর আদর্শ ছাড়তে পারে না। কিন্তু সেই কংগ্রেসই আবার যেদিন তপসিলী হিন্দুদের জন্য আসন সংরক্ষণের নীতিকে চিরকালের জন্য মেনে নিয়ে 'জাতীয়তার উচ্চভাব ও মহান আদর্শকে জলাঞ্জলি দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না।' [পৃষ্ঠা ৭][৫২]

কংগ্রেসের এই আচরণে উপন্যাসের শফিকুলের মতো শিক্ষিত তরুণেরা হতচকিত ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। মুসলমানদের মনে কংগ্রেসের প্রতি চির অবিশ্বাস তৈরি হয়েছিল। শফিকুলের মতো নেতারা মনে করেছিল—''কংগ্রেসের জাতীয়তার আবরণটা ভুয়ো। কংগ্রেসের কাছে হিন্দু স্বার্থটাই দেশের স্বার্থ।'' [পৃ. ২৭৮][৫৩] বাংলায় মুসলমানদের অন্তর থেকে কংগ্রেস ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। কারণ, বাংলার কংগ্রেস হিন্দু জমিদার মহাজনের স্বার্থ রক্ষার দিকেই দিনে দিনে ঝুঁকে পড়ছে। অর্থাৎ বাংলার আকাশে বাতাসে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের মাত্রা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে সম্বন্ধে বি. টি. রণদিভে বলেছেন—''কয়েকটি পকেট ছাড়া গোটা দেশের মুসলমান সমাজের মধ্যে কংগ্রেসের প্রভাব বলতে কিছু নেই। মুসলমান জনসাধারণের কাছ থেকে কংগ্রেস একেবারেই বিচ্ছিন্ন।'' [উত্তালচল্লিকা, অসমাপ্ত বিপ্লব, পৃ. ১৭৪][৫৪] এরই মধ্যে শফিকুল (ফটিক) এর মনে পড়ে যায়, মেজোবাবুর বলা কথাগুলো—

> দেখবে হিন্দু আর মুসলমান, এদের মধ্যে মধ্যবিত্তের সংখ্যা যত বাড়বে, সাম্প্রদায়িকতাও তত বাড়বে। কারণ হিন্দু আর মুসলমান এই দুই শ্রেণীর শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র হবে চাকরি আর রাজনীতির সীমাবদ্ধ পরিসরে। এই গুঁতোগুঁতি কেবল চেয়ারের দখল নিয়ে হয় কেরাণীর চেয়ার আর না হয় মন্ত্রীর চেয়ার। এই তো। আমরা যদি আমাদের দৃষ্টিকে, চেতনাকে,বোধকে দেশের বৃহত্তম আঙিনায় প্রসারিত করে না দিই, সমগ্র দেশকে যদি দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য এবং নিরানন্দের কবল থেকে মুক্ত করতে এগিয়ে না যাই, তেমন বাস্তব কর্মসূচী গ্রহণ না করি, এবং তাকে কাজে রূপ দেবার চেষ্টা না করি, তবে আমাদের সর্বনাশ কেউ ঠেকাতে পারবে না। মধ্যবিত্তের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সুযোগ আদায়ের যে গলাকাটা প্রতিযোগিতা তথাকথিত শিক্ষিত হিন্দু আর মুসলমান শুরু করেছে, এর মধ্যে কোনও কল্যাণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, এ বিভেদকেই বাড়িয়ে দেবে। এবং এমন একদিন আসতেও পারে যেদিন হিন্দু মুসলমানের গলায় আর মুসলমান হিন্দুর গলায় সত্যি সত্যিই ছুরি বসাতে দ্বিধা করবে না। [পৃ. ২৯০][৫৫]

এপ্রসঙ্গে অমলেন্দু সেনগুপ্তের নিজস্ব একটি অভিজ্ঞতার কথা স্মরণযোগ্য। তিনি লিখছেন—

> ১৯৩৮ সালে জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখি হিন্দু-মুসলমান দুটি জাত। বিশেষ করে সেটা প্রকট হল ১৯৪১ সালের সেন্সার-এর সময়। দুপক্ষই উঠে পড়ে লাগল—বেশি করে নিজের সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা দেখানো জন্য। নিজের সম্প্রদায়কে প্রমাণ করতেই হবে। দুপক্ষ থেকে 'কাম্পেন' শুরু—এখনো কানে ভাসে কিশোরগঞ্জের মুসলিম ইনস্টিটিউটে মোনেন খাঁর বক্তৃতা। পয়দা কর আর পয়দা কর। দেখছ না হিন্দুরা কী হারে লোকসংখ্যা বাড়িয়ে ফেলেছে। কোন্‌টা কার সন্তান—তারই নেই ঠিক। তোমরাও আর পেছিয়ে থেকো না বিধবা-বেওয়া বেবাক সব বিয়া কর্‌্যা ফেল।
>
> অত্যন্ত ঘৃণ্য, স্থূল আর অশ্লীল বক্তৃতা। ....তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জুবিলী পার্কে শ্যামাপ্রসাদের বক্তৃতা। সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াতে শ্যামাপ্রসাদের সাথী নন্দ ঘোষের জুড়ি নেই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বইতে নাকি 'বিল্বফল খাইতে সুস্বাদু'র জায়গায় লেখা 'গোমাংস খাইতে সুস্বাদু'। [উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব, পৃ. ১৭৩][৫৬]

কিন্তু বাংলাদেশে জমিদার হিন্দু প্রজা মুসলমান, মহাজন হিন্দু খাতক মুসলমান, উকিল হিন্দু মক্কেল মুসলমান, ডাক্তার হিন্দু রোগী মুসলমান, হাকিম হিন্দু কয়েদি মুসলমান, খেলোয়াড় হিন্দু দর্শক মুসলমান। এই হিন্দু-মুসলমানের

দ্বন্দ্ব মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাকরি এবং রাজনীতির অধিকারকে নিয়ে। ১৯৩৭ সালের ৩১ মার্চের বেঙ্গল কাউনসিলির নির্বাচনের পর, আনন্দবাজার পত্রিকা ফলাফলের যে রিপোর্ট পেশ করেছিল তা ছিল নিম্নরূপ—

> 'আইন পরিষদে টোটাল মেমবার হচ্ছে আড়াইশ।' তারি মধ্যি মুসলমানরা পাইছেন অ্যাকশ বাইশ। বর্ণ হিন্দু চৌষট্টি, তপশিলী হিন্দু পঁয়ত্রিশ, ইওরোপীয়রা পঁচিশ আর অ্যাংলো ইন্ডিয়ান চার। [পৃ. ৩২৭][৫৭]

এরপর উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাস, বিদ্বেষ, উগ্রতা, পরস্পরের প্রতি দোষারোপ ক্রমশ বাড়তে থাকে। এর মধ্যে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমগুলো বিরূপ সংবাদ পরিবেশন করার ফলে বিদ্বেষের আগুন আরো দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। সংবাদপত্রের সংবাদ পরিবেশনের বিবরণ দিয়েছেন লেখক—

> খবরের কাগজগুলো এমন মাত্রাছাড়া চিৎকার শুরু করেছে যে রক্তমাংসের মানুষ, ব্যক্তি মানুষ গুলিয়ে যাচ্ছে সাম্প্রদায়িক ভেদ চিহ্নের অতল গহ্বরে। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় এখন কোনও ব্যক্তি আর কোনও ব্যক্তিকে খুন করছে না, কোনও দুর্বৃত্ত পুরুষ আর কোনো নারীকে ধর্ষণ করছে না। এখন এক সম্প্রদায় খুন করছে অন্য সম্প্রদায়কে, এক সম্প্রদায় ধর্ষণ করছে অন্য সম্প্রদায়কে। এখন যেদিকে তাকান যাক না কেন, সেইদিকেই শুধু হিন্দু কর্তৃক মুসলমান হত্যা, এখন শুধু মুসলমান কর্তৃক হিন্দু রমণী ধর্ষণ। এখন যেন মসজিদের সামনে বাজনা বন্ধ করাকে মুসলমানরা এবং গোরু কোরবানি বন্ধ করাটাকেই হিন্দুরা জীবনের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে ধরে নিয়েছে। গোরুর গলায় ছুরির কোপ থামানোর জন্য মানুষের গলায় ছুরি চালাতে দ্বিধা করছে না কেউ। গোরুর জীবনের চাইতে মানুষের জীবনের কদর কমিয়ে দেয় যে মনোবৃত্তি তাকে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতে দেখে ফটিক শংকিত হয়ে পড়ছে। [পৃ. ৩৩৭][৫৮]

উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র ফটিক বুঝে উঠতে পারে না যে, এত সব কেন হচ্ছে? অনেক ভেবে চিন্তে সে দেখে চারপাশেএই সমস্ত কিছু সংঘটিত হচ্ছে নির্বাচনে ভোট পাবার জন্য। আর সেই কারণেই ফটিক নিজের মধ্যে বিষণ্ণ বোধ করতে থাকে।' নির্বাচন প্রসঙ্গে ফটিকের জনাব রেজাউল করিমরে কথা মনে পড়ে যায়। তিনি নির্বাচন প্রসঙ্গে বিবৃতি দিয়েছেন তা ফটিকের কাছে বাস্তবসম্মত বলে মনে হয়েছে। তিনি বলেছিলেন—

> যেখানে নির্বাচকমণ্ডলী অজ্ঞ, ধর্মান্ধ ও মধ্যযুগীয় আদর্শে আস্থাবান আর প্রার্থিগণ স্বার্থপর, প্রতিক্রিয়াশীল ও সরকারপূজক সেখানে নির্বাচনের ফলাফল যাহা হওয়া উচিত বাংলার অনেক জেলাতে তাহাই হইয়াছে। নির্বাচকগণকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান দান করা হয় নাই, সেই বাস্তব বস্তুর ভিত্তিতে দল গঠনের ব্যবস্থাও হয় নাই। তাহারই কারণে বহু অযোগ্য লোক নির্বাচিত হইয়াছে। কেহ লিগ বোরডের নামে, আবার কেহ মুসলিম স্বার্থের নামে, কেহ বা গো কোরবানির নামে, আবার কেহ বা ইসলাম জোশ্ বজায় রাখিবার নামে নিজেদের জন্য ও আত্মীয় স্বজনদের জন্য আসনগুলি নিরাপদ করিয়া লইয়াছেন কিন্তু একবারও গোটা সমাজের কথা ভাবেন নাই। প্রতিযোগী প্রার্থীদের যোগ্যতার কথাও চিন্তা করেন নাই। [পৃ. ৩৩৯][৫৯]

উপন্যাসটিতে আমরা দেখতে পাই সফিকুল (ফটিক) নিজে নির্বাচনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেনি। কিন্তু নির্বাচন সম্পর্কে বিভিন্ন মহলের প্রতিক্রিয়া সে খুব কাছ থেকে লক্ষ করেছে। আর তাতেই সে ভয় পেয়েছে। কারণ—

> সে দেখেছে নির্বাচনী প্রচার হিন্দুকে কেমন আরও হিন্দু এবং মুসলমানকেকেমন আরও মুসলমান করে তুলেছে। সে দেখেছে শিক্ষিত ভদ্র মুসলমানও কেমন নির্বিচারে এক ধরনের হিন্দু বিরোধী উন্মত্ততাকেই ইসলাম বলে গ্রহণ করছেন। মৌলবি জয়নুদ্দিনের মত নিরীহ লোকও ইসলামের নামে কেমন উগ্র হয়ে উঠছেন। এবং শিক্ষিত হিন্দুও বিচারবোধ জলাঞ্জলি দিয়ে মার মার করে উঠছেন। ফটিক তাও লক্ষ্য করেছে। এবং উদ্বেগ বোধ করেছে। তুমি মুসলমান হলেই চলবে না। আমার নারায় তোমাকে গলা মেলাতে হবে। তুমি যদি তা না মেলাও তবে তুমি সন্দেহভাজন, তবে তুমি জাতিদ্রোহী, তুমি হিন্দুর চর। তুমি শত্রু। এই হল মুসলিম রেনেসাঁর লজিক। তাই এই উগ্রতাকে বেজায় ভয় পায় ফটিক। [তদেব, পৃ. ৩৩৯][৬০]

শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস-প্রজা কোয়ালিশন মারা গিয়েছে। ভূমিষ্ঠ হতে পারেনি। এই কংগ্রেস-প্রজা কোয়ালিশন ছিল ফটিকের মতো সাধারণ মানুষের ভরসা। সেই অজাত মুখটা কেমন হত? কল্পনায় সেই মুখটাকে আঁকতে চেষ্টা করে ফটিক। কিন্তু কোনও পরিষ্কার আদল তার ভাবনায় ফুটে ওঠে না। ঠিক যেমন, তার মৃতজাত পুত্রের মুখ খানাকে মনে করার চেষ্টা করেও মনে করতে পারে না।

আবার এরই মধ্যে ভারতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে নানা ধরনের জটিলতা দেখা দিতে থাকে। স্বরাজ দাবির প্রস্তাব রাজনৈতিক বন্দি মুক্তি ; মহাজনী আইন পাশ। ভারতবর্ষের রাজনীতির মানচিত্রে কংগ্রেস-লিগ-হিন্দু মহাসভার পাশাপাশি কমিউনিস্ট পার্টিও তার প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৩৫ সালে ভারতের জাতীয় আন্দোলনে কমিউনিস্ট আন্দোলন এক নতুন ধারার সূত্রপাত করেছিল। তারপর ধীরে ধীরে তাদের আন্দোলনের গতি কিছুটা শ্লথ হয়ে পড়ে।

এর প্রধান কারণ এঁদের সঙ্কীর্ণ শ্রেণি চরিত্র। এদের আন্দোলন ছিল শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণিদের কেন্দ্র করে। এই আন্দোলনের নেতারা সবাই ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ। রাজনৈতিক বন্দিমুক্তিকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস ও লিগের মধ্যে নানা মতবিরোধ চলতে থাকে। কংগ্রেস নেতাদের কাছে রাজনৈতিক বন্দিমুক্তি বিষয়টি ছিল জাতীয় সম্মান অসম্মানের প্রশ্ন। তাঁরা বলেছিল আন্দামান দ্বীপে শতশত রাজবন্দি অনশন করে জীবনমৃত্যুর মাঝখানে ঝুলছে। সেই ঘটনার সাথে কৃষক খাতকের অর্থনৈতিক প্রশ্নের তুলনা অবান্তর প্রসঙ্গ ছাড়া কিছু নয়। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আবুল মনসুর বলেন—

> যদি এখনই আবার নির্বাচন হয় আমরা হেরে যাব। মুসলিম লিগের কাছে আমরা হেরে যাব। কারণ সবাই জানেন, নির্বাচনের সময় তারা কৃষক প্রজা পারটিকে কংগ্রেসে লেজুড় বলে আখ্যা দিয়েছে এবং কৃষক-খাতকের কল্যাণের সমস্ত ওয়াদাকে ভাঁওতা বলে অভিহিত করেছে। এখন যদি আমরা কৃষক-খাতকের হিতের জন্য কোনও আইন পাশ না করেই রাজনৈতিক ইসুতে পদত্যাগ করি তাহলে মুসলিম লিগের সেই মিথ্যে অভিযোগই সত্য বলে প্রমাণিত হবে। [প্রেম নেই, পৃ. ৩৪০.][৬১]

অন্যদিকে রাজনৈতিক বন্দিমুক্তিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অস্থিরতা চরমে উঠতে থাকে—

> প্রজা দল যা মানেন কংগ্রেসই সিডা মানেন। তা সত্ত্বেউ দু নম্বর দফারে চার নম্বরে নামায়ে আনতি, নীতিগত কারণে নয়, কৌশলগত কারণেও কংগেরস রাজী হলেন না। এমন কি ইডাও কংগ্রেসরে কওয়া হল, বেশ তালি না হয় বন্দিমুক্তির দাবি দুনম্বরেই থাকল। কিন্তু ইডা আপনারা কন যে লাট সাহেব ভিটো দিয়ে বন্দিমুক্তির সরকারি দাবি নাকচ করে দিলি আপনারা মন্ত্রিসভার তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ কত্তি বাধ্য করবেন না। পদত্যাগ করার আগে মহাজনী আইনডারে অন্তত পাস করায়ে নিতি দেবেন। না, তাতেও কংগ্রেসের নেতারা রাজী হলেন না। বৈঠক ভাঙে গেল। আফসোস। আফসোস! [প্রেম নেই, পৃ. ৩৪০][৬২]

অর্থাৎ ভারতবর্ষের রাজনীতির ইতিহাসে ভাঙনের খেলা অব্যাহত রয়ে গেল। রাজনৈতিক ভাঙনের চুড়ান্ত রূপ আমরা দেখতে পাব লেখকের ‘প্রতিবেশী’ উপন্যাসটির মধ্যে।

বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক এবং পঁচিশ বছর ধরে তার বিবর্তন। এই বিষটয়টিকে উপন্যাস তিনটির কেন্দ্রে রেখে লেখক তৎকালীন সময়ের বাংলা তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভাঙা-গড়ার ইতিহাস পাঠককুলকে প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। গোড়ায় যা ছিল ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সংঘাত সেটাই ক্রমে গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বে এবং শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে পৌঁছে দেশকে খণ্ড খণ্ড করে, তারই চিত্রই ট্রিলজি উপন্যাস তিনটি বহন করছে। ভারত ইতিহাসের ট্র্যাজিডি শেষ পর্যন্ত মানব মানবীর ব্যক্তিগত ট্র্যাজিডিতে পরিণত হয়েছে। ট্রিলজি উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের কাহিনি শুরু হয়েছে ১৯২২ সালে আর উপন্যাসের তৃতীয় তথা শেষ খণ্ডের কাহিনি শেষ হয়েছে ১৯৪৬ সালে। অর্থাৎ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় পর্যন্ত। গ্রাম সমাজ আর তার সামাজিক সংঘাত থেকে জাত রাজনীতি খুব সার্থক ভাবেই এই কাহিনির পটভূমি রচনা করেছে। এই উপন্যাস তিনটি সম্পর্কে গৌরী আইয়ুর ‘প্রতিবেশী’ উপন্যাসের ভূমিকায় বলেছেন—

এই উপন্যাসের রাজনীতি শরৎচন্দ্রের গ্রাম্য দলাদলি মাত্র নয়। চরিত্র-হনন, অরুচিকর কলহবিবাদ আর ঘোঁট পাকানোতেই এর শেষ হয়ে যায় না। এই উপন্যাসের রাজনীতি আরও সদর্থে এবং গৃহীতার্থে রাজনীতি হয়ে উঠেছে। যার মূলে আছে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ। এই দুই সমাজের বৈষম্য আর পারস্পরিক বিরোধিতা বর্তমান শতাব্দীর প্রায় শুরু থেকেই যেভাবে দ্রুত একটা জটিল রাজনৈতিক সমস্যা ও শেষে প্রবল সংঘর্ষে পরিণত হল তার আনুপূর্বিক কিছু দলিল রয়েছে উপন্যাস তিনটিতে। কিন্তু প্রথম খণ্ডে আমরা শুধু তার প্রাথমিক ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক রূপটাই বেশি পাই।

তোলা তুলতে বাধা পেয়ে হাটমালিকের গোমস্তা নিরাপদর ক্ষিপ্ত আচরণ। সে ছোলেমান নিকিরির সরপুঁটির পসরা টান মেরে কাদায় ফেলে দিয়ে দুপায়ে দলতে থাকে। এই ঘটনার বর্ণনাটি অবিস্মরণীয়। এক্ষেত্রে অত্যাচারী হিন্দু—অত্যাচারিত মুসলমান ; দুইই হিন্দু অথবা দুইই মুসলমান হতে পারত। হলে সেটা ব্যক্তিগত বিরোধ বলে গণ্য হত। কিন্তু দুজন দুই ভিন্ন সম্প্রদায়ের হবার ফলে এবং তৎকালীন রাজনীতির অনুকূল বাতাস পেয়ে একটা সাম্প্রদায়িক ক্রোধের সৃষ্টি করে। [পৃ. ১০][৬৩]

সামাজিক রেষারেষি, আর্থিক প্রতিযোগিতা ততদিনে কলকাতাকেন্দ্রিক রাজনীতির ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক দাঁও কষাকষিতে পরিণত হয়েছে।এই পরিস্থিতিতে দেশবন্ধুর হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট মুসলমানকে যেমন উৎসাহিত করেছিল হিন্দুকে তেমনই ক্ষুব্ধ করেছিল। 'জল পড়ে পাতা নড়ে' উপন্যাসে দেওয়ান বাড়ির মেজ-কর্তা রাজনৈতিক আকাশে সেদিন যে অশনি-সংকেত দেখতে পেয়েছিলেন তার পূর্ণ পরিণত রূপ দেখেছিল 'প্রতিবেশী' উপন্যাসের ফুলকি (অমিতা) আর শামিম। উপন্যাসটিতে শহর ও গ্রামের হিন্দু-মুসলমানদের রাজনৈতিক সম্পর্কের টানাপোড়েন বোঝাতে গিয়ে লেখক যে চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন সেটি হল—

কলকাতা শহরে যে পলিটিক্স্ নিয়ে আমরা মাতামাতি করছি, সেই পলিটিক্সের ভূতই নীলগঞ্জের ঘাড়ে এসে চেপে বসেছে। নীলগঞ্জ ছিল হিন্দু মুসলমানের মিলিত গ্রাম। সেই নীলগঞ্জ, এবার দেখছি, সম্পূর্ণ দুটো নতুন গ্রাম হয়ে উঠেছে। কলকাতা এতই বড় শহর যে, সেখানে কিছুই বোঝা যায় না। ফুলকি, তুমি ভাবতে পারবে না, কি সাংঘাতিক ফ্যানাটিক হয়ে উঠেছে এই গ্রামের মুসলমানেরা, আমার ছেলেবেলার বন্ধুবান্ধবেরা, এরা সব নাকি নতুন করে ইসলামে ফিরছে। নীলগঞ্জের মুসলমান এবার সাচ্চা মুসলমান হয়ে উঠছে। এ যে কী পরিবর্তন, তুমি ধারণা করতে পারবে না। কারণ তুমি এদের চেহারা দেখনি। কলকাতায় তুমি যেসব মুসলমান দেখেছ, ফুলকি, তায়েব চাচা, আবুল মনসুর সাহেব, আবুল হাসেম সাহেব যারা তোমার চেনা, এরা সে মুসলমান নয়। এরা অন্ধ ফুলকি এরা ধর্মান্ধ। এদের সঙ্গে যতটুকু কথাবার্তা আমার হয়েছে তাতে এদের কবন্ধ ছাড়া আর কিছুই মনে হয়নি আমার। [প্রতিবেশী, পৃ. ২৫৮][৬৪]

মুসলমান সমাজে উপর থেকে কংগ্রেসের প্রভাব বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করেছে। এরই মধ্যে মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম বিপন্ন বলে ধর্মের হিড়িক আবার জেগে উঠেছে। চল্লিশের দশক শুরু হওয়ার আগে থেকেই রাজনীতির মঞ্চে ও হিন্দু মুসলিম সমস্যা জট বাধতে থাকে। এর ফলে ১৯৪০ সালে মুসলমান সমাজের কাছ থেকে দাবি উঠতে থাকে পাকিস্তান নামক পৃথক রাষ্ট্রের। নিজেদের পৃথক রাষ্ট্রের দাবিকে কেন্দ্র করে মুসলিমরা ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধ হতে থাকে। ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনে মুসলমানরা অংশগ্রহণ করেনি বরং বিরূপতা দেখিয়ে গেছে।

'প্রতিবেশী' উপন্যাসটিকে আমরা পাঠককুল দেখব অমিতার (ফুলকি) স্মৃতির আয়নায়। উপন্যাসটিতে সুধাকর চক্রবর্তী, তায়েব কাকা, হরিকিশোর, শামিম প্রমুখ চরিত্রের কথা বারে বারে ফিরে ফিরে এসেছে রাজনৈতিক নানান আলোচনাকে কেন্দ্র করে। ক্যানসার আক্রান্ত অমিতা যখন শারীরিক এবং মানসিকভাবে পঙ্গু, যন্ত্রণায় শরীর মন বিধ্বস্ত, যখন বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় ছিন্ন, তখন স্মৃতির সরণী বেয়ে সে চলে যায় অতীতে। যেখানে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে রাজনীতির নানা টানা পোড়েন হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব, এবং শেষ পর্যন্ত ভারত-পাকিস্তান ভাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার ইতিহাস। উপন্যাসটিতে রাজনৈতিক ঘটনার প্রধান প্রতিফলন লক্ষ

করা যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে, ৮ আগস্ট ১৯৪৫ সাল। অথাৎ নেতাজির আজাদ-হিন্দ-ফৌজের সৈনিকদের বিচার হবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। প্রথম অধ্যায় জুড়ে রয়েছে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক। এছাড়া অমিতার ব্যক্তিগত সম্পর্ক। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ক্ষেত্রে এসেছে চিত্তরঞ্জন দাশের সিরাজগঞ্জ সম্মিলনীর কথা। তাঁর স্বরাজ্য দলের কথা। বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ধারণা ছিল—হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্ভব হত, যদি চিত্তরঞ্জন দাশ বেঁচে থাকতেন। বাংলায় রাজনীতিতে চিত্তরঞ্জন দাশ যখন মধ্যগগনে, তখনও সুভাষচন্দ্র বসু রাজনীতিতে আসেননি। দেশবন্ধুর সময় কাল ছিল অনেকের মতে বাংলার রাজনীতির জগতে এক স্বর্ণযুগ। উপন্যাসে অমিতা তার তায়েব কাকার মুখ থেকেই শুনেছিল—

> ওই একবারই বাংলার মুসলমান বাংলার এক হিন্দু লিডারের পিছনে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেশবন্ধুর ত্যাগ তাঁর বিচক্ষণতা, তাঁর দূরদর্শিতা, তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর উদারতা দেশবন্ধুকে বাংলার অবিংসবাদী নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। আর সিরাজগঞ্জসম্মিলনীতেই দেশবন্ধু হয়ে উঠেছিলেন দীপ্ত ভাস্কর। [তদেব, পৃ. ৮৩][৬৫]

১৯২৪ সালের সিরাজগঞ্জ সম্মিলনী ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ একে অপরের সাথে একই সূত্রে আবদ্ধ। একজনের কথা বলতে অন্যজনের প্রসঙ্গ সেই সূত্রে নিজে থেকেই চলে আসে। বাংলার মুসলমানরা তাঁকে দেশবন্ধু বলে মেনে নিতে একটুও দ্বিধা করেনি। উপন্যাসটিতে সিরাজগঞ্জ সম্মেলনীর যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে—

> এতবড় কনফারেন্স তখন আর হয়নি। পনেরশ ডেলিগেটই এসেছিল। লোক জমেছিল হাজার পনের। দেশবন্ধু মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলছেন, হিন্দুরা যদি উদারতার দ্বারা মুসলমানের মনে আস্থা সৃষ্টি করতে না পারে, তবে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য আসবে না। যদি আমরা হিন্দু-মুসলমান ঐক্য গড়ে তুলতে না পারি তবে আমাদের স্বরাজ্যের দাবি কল্পনার সৌধই থেকে যাবে। স্বরাজ্য আসবে না। [পৃ. ৮৮][৬৭]

হিন্দুরা তখন বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম মন্তব্য করতে লাগলেন চিত্তরঞ্জন দাশের মন্তব্যকে কেন্দ্র করে। কেউ বলেছেন, দেশবন্ধু ভোটের রাজনীতির জন্য মুসলমানদের কাছে বাংলাকে বেচে দেওয়ার কথা ভাবছেন। আবার কেউ বলেছেন, কলকাতার কর্পোরেশনকে দেশবন্ধু মুসলমানদের হাতে বেচে দিতে চাইছেন। এত বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও দেশবন্ধু কর্পোরেশন নির্বাচনে জিতেছিলেন। এই সমস্ত মতের বিরুদ্ধে গিয়ে সুধাকরের মতো লোকেরা কলম ধরেছিল। তারা সাধারণ মানুষকে বোঝাতে চেয়েছিল যে, বাংলাদেশের লোক শুধু হিন্দুরাই নয়, মুসলমানেরাও এই বাংলাদেশেরই মানুষ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় দেখা গেছে যে, বাংলাদেশের মুসলমান বাংলাদেশের জনসংখ্যার মেজরিটি। শতকরা ৫৪ জনই মুসলমান। শতকরা ৪৬ জন হিন্দু। কিন্তু শিক্ষা-চাকুরি পেশাগত দিক দিয়ে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠরাই বঞ্চিত। দেশবন্ধু এই অন্যায়ের প্রতিকার করতে এগিয়ে এসেছিলেন। অর্থাৎ দেশবন্ধুর প্রস্তাবিত বেঙ্গল প্যাক্টে দেশকে বেচে দেবার কোনও কথা ছিল না। প্রস্তাবিত বেঙ্গল প্যাক্টে যা ছিল, তা একটি একটি দেশ ও সম্প্রদায়কে ভাঙনের হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা। তিনি মনে করতেন হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের উপরই গড়ে উঠেবে একটা বলিষ্ঠ জাতীয়তাবোধ। দেশবন্ধু তাঁর কথা রেখেছিলেন, কর্পোরেশনের মেয়র হয়ে। তিনি ডেপুটি মেয়র করেছিলেন সুহারাবর্দীকে। আর চিফ্ একজিকিউটিভ্ অফিসার করা হয়েছিল সুভাষচন্দ্র বোসকে। ডেপুটি একজিকিউটিভ করা হয়েছিল হাজি আবদুর রসিদ সাহেবকে। দেশবন্ধুর এই সমস্ত কাজের ফলে বাংলার শিক্ষিত মুসলমান সমাজ হতাশা-তিক্ততা ভুলে গিয়ে নিজেদের উপর আস্থা ফিরে পেয়েছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য চিরতরে চিতার আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়। অন্য দিকে মুসলিমরা তাঁর এই মতের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে লাগল—''ইসলাম বিপন্ন হবার ধুয়ো তুলে বাংলার মুসলিম নেতারা যেভাবে দিন দিন নতুন করে তেড়ে ফুঁড়ে মুসলমান হতে শুরু করেছেন। ভাষাটাকেও পর্যন্ত হিন্দু আর মুসলমানে ভাগ করে ফেলতে চাইছেন। [পৃ. ৮৬][৬৭]

ভারতের রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা যত সময় এগিয়েছে তত জটিল আকার ধারণ করেছে। ইতিহাস যার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। সাহিত্যে তার কিছুটা প্রভাব দেখতে পাই। যেমন পাই গৌরকিশোর ঘোষের উপন্যাসে। লেখকের ট্রিলজি উপন্যাসের প্রথম দুটি খণ্ডে আমরা দেখতে পাই চল্লিশের দশকের পূর্ব পর্যন্ত রাজনৈতিক

টানাপোড়েনের কাহিনি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু চল্লিশের দশকের উত্তাল সময়ের রাজনৈতিক টানাপোড়েনের কাহিনি আমরা দেখতে পাই ট্রিলজির শেষ খণ্ড 'প্রতিবেশী' উপন্যাসটিতে। আমরা প্রায় সকলেই জানি চল্লিশের দশক বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। শুধু মাত্র ভারতবর্ষেরই নয় বিশ্বের রাজনীতিতে এই সময়টির একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আমরা দেখেছি ১৯৩৯ সালে সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। তার প্রভাব ভারতবর্ষের রাজনীতিতেও পড়েছিল। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে শুরু হয় গান্ধিজির নেতৃত্বে ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন। তার দুবছর আগে অর্থাৎ ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। এবং মুসলমানদের জন্য আলাদা একটি রাষ্ট্রগঠনকে কেন্দ্র করে আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হয়ে উঠল। আার এই দশকেই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের মাধ্যমে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে সশস্ত্র প্রত্যক্ষ সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল তা ছিল অনেক বেশি জোরদার। এরইমধ্যে ১৯৩২ ও ১৯৪৪ সালে দেখা দিয়েছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আকার, মহামারি, অবক্ষয় মৃত্যু। এই সম্পর্কে অমলেন্দু সেনগুপ্ত মহাশয় বলেছেন—

> ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ বছর দুটি যেন মানুষের জীবনে দুঃসহ অভিজ্ঞতার ঝাঁপি উপুর করে দিয়েছে। আকাল মহামারী অবক্ষয় মৃত্যু—এই বুঝি তার বিধিলিপি। সর্বাত্মক ধ্বংসের কিনারায় এসে পৌঁছেছে গোটা দেশ ও সমাজ—তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। চেতনার স্পন্দনটুকুও কোথাও আর অবশিষ্ট নেই। [উত্তাল চল্লিশ, অসমাপ্ত বিপ্লব, পৃ. ২৩] [৬৮]

সেদিন শুধুমাত্র শহর-শহরতলিই নয় গ্রামবাংলার মানুষও নিছক বাঁচার জন্য এক কঠিনতম লড়াইয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। 'উত্তাল চল্লিশ, অসমাপ্ত বিপ্লব' গ্রন্থটিতে লেখক অমলেন্দু সেনগুপ্ত দেখিয়েছন—''১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসেও ধান বিক্রি হয়েছিল চৌদ্দ আনা মন করে। ১৯৪৩ সালে মাত্র তিন মাসের মধ্যে সেই চালের দাম তিন টাকা মন থেকে ছাপান্ন টাকায় গিয়ে পৌঁছাল। তারপর দেখা গেল শতাব্দীর করুণতম দৃশ্য। লক্ষ লক্ষ নিরন্ন মানুষের কলকাতামুখী মিছিল। ভাতের নয়—তারা ফ্যান চাইছে শহরবাসীর কাছে।" [পৃ. ২৪] [৬৯] অন্যদিকে বাংলার এই রকম পরিস্থিতিকে লক্ষ করে গোপাল হালদার 'মন্বন্তরের তিনপর্ব' উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডে বলেছেন—

> নিরন্নের জোয়ার গ্রাম ছাপিয়ে এসে পড়ছে শহরে। দিল্লীর বা লালদীঘির কোনো 'কেনুটের' আদেশ তাঁকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। রাসবিহারী এভিন্যু ছাপিয়ে বন্যা পৌঁছেচে রসা রোডে, পৌঁছেচে তা চৌরঙ্গীর সীমানায়। চব্বিশ পরগণা, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী—বুঝি সমস্ত বাংলার হতভাগ্যরা দেখতে এসেছে তাদের রচিত ঐশ্বর্য প্রাসাদপুরী কলকাতা। [তেরশ পঞ্চাশ পৃ. ৬৩৯] [৭০]

এই সমস্ত নিরন্ন, অর্ধউলঙ্গ মানুষগুলো ছুটে চলেছে খাদ্যের তাড়নায় গ্রাম থেকে শহরে। সেখানেও খাদ্যকে কেন্দ্র করে 'কুকুর-মানুষের কাড়াকাড়ি'। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিও দিনদিন খারাপ হতে চলেছে। হিরোশিমার উপর আমেরিকা অ্যাটম বোমা ফেলেছে। ''কত হাজার নরনারী শিশু প্রাণ হারিয়েছে, কত হাজার হাজার পশুপাখি গাছপালা কীটপতঙ্গ যে পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে তার হিসাব কোনওদিন কেউ করে উঠতে পারবে কিনা সেটা জানা যায়নি। যারা মরেনি তারা আরও হতভাগ্য কারণ তারা যতদিন বাঁচবে রেডিয়েশনের দরুণ চিরজীবন বিকলাঙ্গ হয়ে থাকবে, গর্ভের শিশুও নিস্তার পাবে না।" [প্রতিবেশী, গৌরকিশোর ঘোষ, পৃ. ১১৩] [৭১] কোনো যুদ্ধকে কেন্দ্র করে যে কোনো রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের জীবনই বিপন্ন হয়। একটি যুদ্ধকে কেন্দ্র করে সেই রাষ্ট্রের শিশু ও নারীর জীবনেও নেমে আসে গভীর অন্ধকার। যুদ্ধকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার নারী ধর্ষিত হয়। আমাদের স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে দেশের মধ্যে বিভিন্ন সংঘর্ষ তৈরি হয়েছিল তাতে অসংখ্য নারী ধর্ষিত হয়েছে। এই ঘটনার বিবরণ লেখক কিছুটা দিয়েছেন 'মনের বাঘ' উপন্যাসটিতে। যা আমরা পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে কেন্দ্র করে গ্রামের পুরুষেরা চলে গিয়েছিল যুদ্ধে যোগদান করতে। যুদ্ধ শেষে যখন নিজের দেশ ও গ্রামে ফিরে আসে, তখন সেখানে দেখতে পায় দুমুখো ভাতের জন্য চারিদিকে ক্ষুধার্ত মানুষের হা-হাকার। চারিদিকে ধ্বনিত হতে লাগল 'দেশে চা'ল নেই, দেশে চা'ল নেই' [পৃ. ৬১৬]। এর বিবরণ ঔপন্যাসিক গোপাল হালদার খুব সুন্দরভাবে দিয়েছেন—

গ্রাম খালি করে চলে গেল পুরুষেরা। তারা প্রথম যুদ্ধে গেছল খাটতে, গেছল লেবার কোরে তারপর ; তারপর চেয়েছিল যেভাবে পারে বাঁচতে—বীজধান খেয়ে, জমি বিক্রী করে, গরু বিক্রি করে, ঘটি বাটি বন্ধক দিয়ে। এবার এল গ্রামের বাইরে, ছুটল এখন ভাতের খোঁজে—শুধু নিজের প্রাণ বাঁচানোর চিরন্তন দায়ে—স্ত্রী নয়, পুত্র নয়, পিতা নয়—কেউ আর আপনার নয়। সব চেয়ে আদিম যে চেতনা, প্রাণ-রক্ষা—তাই তাড়িত করে নিয়ে চলেছে তাদের 'বাঁচো বাঁচো'। গ্রামে পড়ে রইল নারীবৃদ্ধ, শিশু, বালক। কিন্তু তারাও মরতে চায় না। তাদের বাঁচবার পথ আছে আর কিছু? আছে বই কি। স্ত্রীলোকের যৌবন এখনো তার বড় সম্পদ। তার দাম আছে—একমাত্র তারই দাম এখনো আছে। কারণ জোৎদারের ঘরে ধান আছে, মহাজনের ঘরে অর্থ আছে, তাদের অনুগৃহীতদের পেটে খাদ্য আছে, আর মিলিটারির নানা কাজের টাকা আছে সামরিক বেসামরিক নানা লোকের হাতে—স্ত্রীলোকের যৌবনের দাম দিতেও ব্যগ্র তারা। যুবতী স্ত্রীলোকের বাঁচবার সুবিধা আছে, অধিকার আছে। ঘর? ধর্ম? মর্যাদা? কতক্ষণের তা?স্বামী? সন্তান? সে সব তো মানুষের আবিষ্কার—সভ্যতার দান। জীবজগতের সব চেয়ে চরম, সব চেয়ে আদিম তাড়না তো ক্ষুধা।

ক্ষুধা, ক্ষুধা, ক্ষুধা। জয়ী হচ্ছে জন্তু ; পরাজয় হচ্ছে মানুষের। [তেরশ পঞ্চাশ, পৃ. ৬১৭][৭২]

অর্থাৎ মানুষের তৈরি করা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছে নারী ও শিশুরা। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে সুভাষচন্দ্র বসুর একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। সুভাষচন্দ্রের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা। ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্যে তিনি আজাদ্ হিন্দ বাহিনী গঠন করেছিলেন। হিন্দু মুসলমান শিখ নানা ভাষীর লোকজনদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল নেতাজির আজাদ্ হিন্দ ফৌজ বাহিনী (১৯৪১)। এবার সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনীতির ক্ষেত্রে কোথাও যেন একটু ভুল হয়ে গিয়েছিল। তার মূল্য দিতে হয়েছিল পরবর্তী সময় তাঁর গঠিত আজাদ্ হিন্দ ফৌজকে। সুভাষচন্দ্র বসু ফ্যাসিবাদের চরিত্রটি বুঝে উঠতে পারেননি। তিনি ব্রিটিশ-বিরোধিতা করতে গিয়ে ফ্যাসিস্টদেরকে ভেবেছিলেন ভারতবর্ষের মিত্র বলে। তাই তিনি প্রথম ফ্যাসিস্ট জার্মানি এবং পরে ফ্যাসিস্ট জাপানের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। এরই মধ্যে শুরু হল ভারতে ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন। গান্ধিজির আগস্ট আন্দোলনের লক্ষ্যই ছিল ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা। এরই মধ্যে কংগ্রেসের প্রধান নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন গান্ধিজি, সর্দার প্যাটেল, পণ্ডিত নেহরু, মৌলানা আজাদ সমেত ওয়ার্কিং কমিটির প্রতিটি সদস্যকে এবং কংগ্রেসের অন্যান্য প্রভাবশালী নেতারা। এবং কংগ্রেসকে বে-আইনি ঘোষণা করা হয়। জাতীয় নেতাদের গ্রেপ্তার, কংগ্রেস সংগঠন বেআইনি ঘোষণা জনসাধারণের উপর অভূতপূর্ব দমন-পীড়ন সমগ্র দেশকে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। কংগ্রেসের নেতৃত্বহীন অবস্থায় জনগণের অসন্তোষ ফেটে পড়ল স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে বাংলা তথা ভারতবর্ষে। শুরু হল দেশ জোড়া স্বতঃস্ফূর্ত সশস্ত্র গণ অভ্যুত্থান। এরই সাথের যুক্ত ছিল ভারতের কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ। ১৯২৪ সালে ভারতবর্ষে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট ধারার বীজ বপন শুরু হয়ে গিয়েছিল। তারপর বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তাদের যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু দুই দশকের শেষ দিকে থেকে তিনের দশক পর্যন্ত কমিউনিস্ট রাজনীতির ধারা খুব ধীর গতিতে এগোতে থাকে। চল্লিশের দশক থেকে ভারতরে স্বাধীনতা আন্দোলনে গণঅভ্যুত্থান যখন জোরদার হতে শুরু করে তখন থেকে কমিউনিস্ট আন্দোলন আবার নতুন মাত্রা যোগ করে বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক জগতে। সামাজিক ক্ষেত্রেও এই আন্দোলন প্রভাব বিস্তার করেছিল। গ্রামাঞ্চলের দলে দলে কৃষক, শ্রমিক, শহরতলির মধ্যবিত্ত শ্রেণিও পিছিয়ে থাকেনি, তারাও এসেছিল এই আন্দোলনে যোগদান করতে। এদের পাশাপাশি শিল্পপতি ও জমিদারদের একাংশও এই আন্দোলনে যোগদান করেছিল। ফলে গণঅভ্যুত্থান জাতীয় অভ্যুত্থানের রূপ গ্রহণ করে। এরই মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঘৃণা তীব্র আকার নেয়। অন্য দিকে এরই মধ্যে শুরু হয় আজাদ্ হিন্দ ফৌজের বন্দি সৈনিকদের বিচার ব্যবস্থা। আজাদ হিন্দ বাহিনীর বন্দিদের হয়ে আইনজীবীর ভূমিকা নিয়েছিলেন জওহরলাল নেহরু। আজাদ হিন্দফৌজের বন্দিদের বিচার ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের লেখক 'প্রতিবেশী' উপন্যাসটিতে তার বর্ণনা করেছেন—

১৯৪৫ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যে প্রস্তাব গ্রহণ করেন তাহা পরের দিন অর্থাৎ ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে উত্থাপিত হয়। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেন যে, স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই, ডঃ কৈলাসনাথ কাটজু, পণ্ডিত জওহরলাল, শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন শরণ মিঃ, আসফ আলীকে (আহ্বায়ক) লইয়া কংগ্রেস একটি ডিফেন্স কমিটি গঠন করিতেছেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও নরনারীগণের বিচারের সময় যাহাতে যথোপযুক্তরূপে তাঁদের পক্ষ সমর্থন করা হয়—এই কমিটি তাহার ব্যবস্থা করিবেন। ইহাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য কিরূপ কার্যক্রম অবলম্বন করা হইবে, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেন যে, ডিফেন্স কমিটি আসামীদের অথবা তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনের নিকট হইতে আবেদনপত্র আহ্বান করিবেন। এই সমস্ত আবেদনপত্রে আসামীদের পক্ষ সমর্থনের বা তাঁহাদের পরিজনবর্গকে সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য ডিফেন্স কমিটিকে ব্যবস্থা করিবার অনুরোধ করিতে হইবে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখের প্রস্তাব কিংবা নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখের প্রস্তাবে আভাসে ইঙ্গিতে পর্যন্ত এমন কিছুই বলা হয় নাই, যাহা হতে মনে করা যাইতে পারে যে, আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকজনকে এবং তাঁহাদের পরিজনবর্গকে আর্থিক সাহায্য দানের জন্য কংগ্রেসের ''একটি সাহায্য কমিটি গঠনের কোনরূপ অভিপ্রায় আছে।'' [পৃ. ১৫০][৭৩]

আজাদ হিন্দ ফৌজের মামলাকে কেন্দ্র করে কলকাতার আবহাওয়া ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। ছাত্র-জনতার পাশাপাশি মুসলিম লিগও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিচারের প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছিল। এই সম্বন্ধে নরহরি কবিরাজ ''স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙলা'' গ্রন্থে বলেছেন—

কংগ্রেস নেতাদের ইচ্ছা ছিল, আজাদ হিন্দ বাহিনীর পক্ষ অবম্বন করে আন্দোলন চালাতে হবে, তবে সেটি হবে অহিংস আন্দোলন। মুসলিম লিগ নিয়মতন্ত্রের পথে আন্দোলন পরিচালনার পক্ষপাতী ছিলেন।

কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী বিক্ষোভ উত্তাল হয়ে উঠেছিল যে তারা কোনো বাধা-নিষেধ মানতে রাজি হল না। যেইমাত্র জানা গেল যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারদের কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে, সেইমাত্র কলকাতা যেন ফেটে পড়ল। ২২ নভেম্বর ১৯৪৫ কলকাতার রাজপথে ছাত্র, নিম্ন মধ্যবিত্ত, অফিস কর্মচারী ও শ্রমিকদের একটি বিশাল শোভাযত্রা বেরিয়ে পড়ল। কলকাতার পৌর শ্রমিকেরা স্ট্রাইক করল। কয়েকদিন ধরে জলকল, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ট্রাম বাস সব কিছু বন্ধ থাকল। কলকাতার পথে পথে ব্যারিকেড তৈরি হল। বাঙলার গভর্নর সেনাবাহিনী তলব করলেন ও কলকাতার রাজপথগুলিতে সেনাবাহিনী টহল দিতে আরম্ভ করল। [—][৭৪]

আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতাদের মুক্ত করার দাবিতে ছাত্ররাও অংশ গ্রহণ করেছিল। তা বিবরণ শামিমের কথার মধ্য দিয়ে লেখক 'প্রতিবেশী' উপন্যাসটিতে দিয়েছেন—

আমি স্বপ্ন দেখি, আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতাদের মুক্ত করার দাবিতে যে আন্দোলন আমরা ছাত্ররা গড়ে তুলছি, সেই আন্দোলন আমাদেরকে হিন্দুকে মুসলমানকে খ্রিস্টিয়ান আর কেই বা অস্পৃশ্য সেই ভেদটা ঘুচিয়ে দেবে। [পৃ. ১৯২][৭৫]

অন্যদিকে জিন্নাহ দ্বিজাতি তত্ত্ব প্রচার করতে শুরু করেছিলেন। তিনি ধীরে ধীরে মুসলিম লিগের একচ্ছত্র নেতা হয়ে উঠছিলেন। কিন্তু জিন্নার দ্বিজাতি তত্ত্ব মুসলিম লিগের অনেক নেতাই মেনে নিতে পারেননি। যেমন—'প্রতিবেশী' উপন্যাসের হাসেম সাহেব বলেছিলেন—'আমি মুসলিম লিগের সদস্য হয়েও জিন্নাহ-এর দ্বিজাতি তত্ত্ব মেনে নিতে পারিনি। আমি বিশ্বাস করতাম বহুজাতি তত্ত্বে। কংগ্রেস বিশ্বাস করত একজাতি তত্ত্বে। এক জাতি এক প্রাণ একতা। এই ছিল কংগ্রেসের স্লোগান বা রাজনৈতিক ধুয়ো।' [পৃ. ১৯৪][৭৬] আমরা আগেই বলেছি আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি আন্দোলন চল্লিশের দশকের ছাত্র আন্দোলনের গোড়া ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। ছাত্রদের জিন্নার দ্বিজাতি তত্ত্বের

উপর আস্থা ছিল না। ফলে কলকাতার রাজনীতিতে ভাঙা গড়ার চূড়ান্ত পর্যায় দেখা দেয়। সেই ঘটনার রূপ দর্শিয়েছেন লেখক আলোচ্য উপন্যাসটিতে। উপন্যাসটির দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিশতম পরিচ্ছেদে এই ঘটনারই চিত্র আমরা দেখতে পাই—

> প্যারাগনের সাইনবোর্ডটা দেখতে পেল অমিত, শামিম ঢুকতে যাচ্ছে। এমন সময় একতাল ধোঁয়া মাটি ফুঁড়ে আকাশের দিকে উঠতে শুরু করল। শামিমকে ঢেকে ফেলল সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলী। ....অমিতা কলেজ স্কোয়ারের দিকে তাকিয়ে দেখল অসংখ্য ছাত্রের জটলা। সকলেই উত্তেজিত। সকলেই ক্রুদ্ধ। জটলা ক্রমে চলতে লাগল। ফুলকি চোখ থেকে ধোঁয়ার আবরণ সরাতে সরাতে পথে এসে নামল। অমনি সেই উত্তেজিত ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ মানুষের স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল। ...জনস্রোত কলেজস্ট্রিটকে ভাসিয়ে বউবাজারকে ভাসিয়ে ওয়েলিংন স্কোয়ারকে ভাসিয়ে খড়কুটোর মতো ভেসে চলছে। ....অমিতার পাশ থেকে কে একজন বলে উঠল 'রামেশ্বর ব্যানার্জি মারা গেল।' কে রামেশ্বর ব্যানার্জি? কোথায় মারা গেল? কেন মারা গেল? ....রামেশ্বর ব্যানার্জি, বয়স উনিশ বছর। ওর বাবার নাম সৌরীন ব্যানার্জী। যতদূর জানা গিয়েছে, ওদের বাড়ি ১৯৮ বি হরিশ মুখার্জি রোড। ধর্মতলা স্ট্রিট আর ম্যাডান স্ট্রিটের মোড়ে। নিউ সিনেমার সামনে সে পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছে। পুলিশ ওকে গুলি করল কেন?
>
> বাহ্, আপনি জানেন না, আজ যে ছাত্র বিক্ষোভ। আজ যে আজাদ হিন্দু ফৌজের মুক্তি দিবস। [পৃ. ১৯৮-১৯৯] [৭৭]

আমরা উপরিউক্ত যে সমস্ত বিবরণ পেলাম তা আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম হাঙ্গামা মিটতেই আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন রসিদ আলিকে মুক্ত করা নিয়ে কলকাতার ছাত্রদের মধ্যে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল তারই চিত্র।

> নভেম্বর মাসে ক্যাপ্টেন শাহ্ নওয়াজ, ক্যাপ্টেন সায়গল আর ধীলন, আজাদ হিন্দ ফৌজের এই তিন সেনানীর উপলক্ষে করে তুমুল ছাত্র বিক্ষোভ হয়ে গেল কলকাতায়। হাঙ্গামার জের দু-তিনদিন ছিল। রামেশ্বর ছাড়া আরও অন্তত ২০ জন শহীদ হয়েছিলেন পুলিশের গুলিতে। কিন্তু ফেব্রুয়ারিতে আজাদ হিন্দ ফৌজের আর একজন সেনানী রসিদ আলির মুক্তির দাবিতে ছাত্র বিক্ষোভ কলকাতায় হয়েছিল, তা উত্তেজনায় আলোড়নে হাঙ্গামায় নভেম্বরের হাঙ্গামাকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬—হাঙ্গামা শুরু হয়েছিল আর তার জের চলেছিল ১৪, ১৫ তারিখ পর্যন্ত। শহীদের সংখ্যাও ঢের বেড়ে গিয়েছিল। এই কদিনে মোট শহীদ হয়েছিলেন প্রায় ৬০ জন। [প্রতিবেশী, পৃ. ২৪০] [৭৮]

সেদিন কলকাতার রাস্তায় পুলিশ এবং ছাত্রদের মধ্যে বীভৎস সংঘর্ষ বেঁধেছিল আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনানীদের বিচারকে কেন্দ্র করে। সেদিন কলকাতার আকাশ-বাতাস ভরে গিয়েছিল টিয়ার গ্যাসের কালো ধোঁয়ায়। সেই সঙ্গে গুলি চলছে। টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ছে। লাঠি চালাচ্ছে পুলিশ। সেদিন কলকাতার রাস্তায় আরেকটি জিনিস লক্ষ করা গিয়েছিল 'কংগ্রেস আর মুসলিম লিগের পতাকা এক হয়ে গিয়েছিল'। এইব্যাপারে ছাত্র সমাজই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কারণ ছাত্র সমাজ জানত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে কোনো সংগ্রামে জয়ী হওয়া সম্ভব। শুধু ছাত্ররা নয়, আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনা নায়কদের বিচারের খবরে স্বাভাবিকভাবেই নৌ সেনারাও চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তির জন্য সমগ্র দেশে যে সংঘবদ্ধ লড়াই শুরু হয়েছিল, সেই সময় থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির একক পথ চলা শুরু হয়। এই সম্বন্ধে অমলেন্দু সেনগুপ্ত বলেছিলেন—

> জাতীয় কংগ্রেসের পরিমণ্ডলের বাইরে নব পর্যায়ে যখন কমিউনিস্ট পার্টির একক পথ চলা শুরু এদিকে তখন কংগ্রেসের সভায় মানুষের উপচে পড়া ভিড়। সে সময় কলকাতায় সদ্য কারামুক্ত শরৎবসু জনপ্রিয়তার শিখরে বিরাজ করছেন। জেল থেকে বেরুতেই শরৎ বসু প্রথমে হাওড়া ময়দানে—তারপর দেশবন্ধু পার্কে সংবর্ধিত হলেন। দেশবন্ধু পার্কে ভিড়ের চাপে একজন মারা গেল। লক্ষাধিক মানুষের ভিড়। অন্যদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে শরৎ বসু গাইলেন—কদম কদম বড়ায়ে যা। আজাদ হিন্দ ফৌজের গান। আই. এন. এ. বা আজাদ হিন্দ ফৌজের খাকি উর্দিপরা সেনাদের তখন কলকাতার রাস্তা ঘাটে দেখা যাচ্ছে। তাঁদের দেখে মানুষের বাঁধাভাঙা আবেগ।

দিল্লির লালকেল্লায় তখন আই. এন.এ.-র সেনানায়ক শনাওয়াজ, সেগল আর ধীলনের বিচারের আয়োজন। [উত্তাল চলিশ অসমাপ্ত বিপ্লব, পৃ. ৪৩-৪৪][৭৯]

ফেব্রুয়ারি মাসের হাঙ্গামা নভেম্বরের হাঙ্গামার থেকেও বীভৎস আকার ধারণ করেছিল। সেই ঘটনার কিছু বিবরণ আমরা দেখতে পাই উপন্যাসটিতে। হিংসা আর উন্মাদনা যে ছাত্রদের গ্রাস করেছিল তারই চিত্র।

ছাত্ররা একইভাবে ১৪৪ ধারা ভাঙছিল, একইভাবে সরকার, সরকারের পুলিশ তোমাদের ওপর লাঠি মারছিল, টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ছিল, গুলি চালাচ্ছিল। বাড়িঘরে আগুন লাগাচ্ছিল গাড়ি পুড়িয়ে দিচ্ছিল। [পৃ. ২৪১][৮০]

শরৎচন্দ্র বসুর পূর্বের দেখানো পথেই ছাত্ররা আন্দোলন করে চলেছিল, 'সেই আগের বার যেমন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সভা হয়েছিল, যেমন শরৎবাবু সরকারের উপর চাপ দিয়ে ডালহৌসি স্কোয়ারে যাবার রাস্তা করে দিয়েছিলেন, এবারও তো তাই হল।' [পৃ. ২৪১][৮১] অন্যদিকে শরৎবাবু বিবৃতি দিতে লাগলেন—

শহরের গুণ্ডাপ্রকৃতির এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকেরাই যে অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে, গত দুইদিনের ঘটনায় তাহা আর একবার প্রমাণিত হইল।... গত কল্যকার সভা ও শোভাযাত্রা আগাগোড়া শান্তিপূর্ণ ছিল, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লাঠি ও গুলিচালনার কোনই অজুহাত বা যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না।.... আমরা সংবাদ পাইয়াছি যে ঐ সকল লোক পথচারীদিগকে এবং সরকারি ও বে-সরকারি যানবাহনসমূহকে আক্রমণ করিয়াছে। কোনও কোনও স্থলে তাহারা মোটর গাড়ি মোটর লরিতে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে। এমন কি তাহারা গৃহস্থবাড়ির আসবাবপত্রেও আগুন দিতে দ্বিধা করে নাই। আমরা অতি বিনীতভাবে কলিকাতার নাগরিকগণকে, বিশেষ করিয়া যুবক দিগকে এই বিষয়টি উপলব্ধি করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি যে, এই শহরকে গুণ্ডাদের ও দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকেদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে না।....যে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলিতেছে তাহার সাফল্যকল্পে আমাদিগকে শান্ত ও নিয়মশৃঙ্খলাধীন সৈনিকের ন্যায় কাজ করিতে হইবে। [প্রতিবেশী, পৃ. ২৪১][৮২]

উক্ত এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্যার নাজিমুদ্দিন ও মিঃ এইচ এস সুরাবর্দীর বিবৃতিও বেরিয়েছিল—বিবৃতিতে তাঁরা বলেছিলেন—

গত সোমবার যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা অত্যন্ত শোচনীয়। আমরা রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে নাগরিকগণকে অদ্য (মঙ্গলবার) বেলা ১টার সময় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সমবেত হইতে অনুরোধ করিতেছি। ঐ সভায় আমাদের কর্মপন্থা নির্ধারিত হইবে। তৎপূর্বে আমরা প্রত্যেককেই শান্তিরক্ষা করিতে এবং শান্ত থাকিতে অনুরোধ করিতেছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আমাদের ন্যায়সঙ্গত উদ্দেশ্যের বৈধতা প্রতিপন্ন হইবে। আমাদের যে সমস্ত মুসলমান ও হিন্দুভ্রাতা আহত হইয়াছেন, তাহাদিগকে আমরা আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি। [প্রতিবেশী, পৃ. ২৪১][৮৩]

কলকাতার দাঙ্গার আগুন নিভতে না নিভতে আবার আগুন জ্বলে উঠল বোম্বাই ও করাচিতে। কলকাতার মতো সেখানেও কমিউনিস্ট, লিগ এবং কংগ্রেস একত্রে বোম্বাইয়ের পথে পথে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর হয়ে বিদ্রোহে শামিল হল। বোম্বাইয়ের পথে আগুন জ্বলে উঠল। এবার আর গুলির বিরুদ্ধে নিরস্ত্র নাগরিকের ইঁট পাথরে নয় গুলির বিরুদ্ধ গুলি, কামানের বিরুদ্ধে কামান গর্জন করে উঠল। সশস্ত্র মিলিটারির আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতীয় নাবিকদের বিদ্রোহও সশস্ত্র বিদ্রোহের পথ গ্রহণ করেছিল। ইতিহাসের হিসেব অনুযায়ী 'বোম্বাই নৌ বাহিনীর দশ হাজার ভাইয়ের মৃত্যু ঘটেছিল।' এদের মৃত্যু দেশের সমস্ত মানুষকে আবার এক হবার আহ্বান জানায়। এই আন্দোলনের রাজনৈতিক চেহারা সম্পর্কে অমলেন্দু সেনগুপ্ত 'উত্তাল চল্লিশ, অসমাপ্ত বিপ্লব' গ্রন্থে বলেছেন—

আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তির জন্য লক্ষ ভারতবাসী সাড়া দিয়াছেন, সেই দাবিতেই ইহারাও আজ রক্ত ঢালিতেছে, গোরা ও কালার যে বৈষম্য সমস্ত ভারতবাসীর জীবনকে অভিশপ্ত করিয়াছে সেই বৈষম্য দূর করিতেই ইহারা আজ জীবন দিতেছে। ভারতবাসীর জীবন দিয়াই উহাদের বাঁচাইতে হইবে।

বোম্বাইয়ের মজুর শ্রেণি সেই পথে সবার আগে বাড়িয়াছে। সমস্ত কারখানার লক্ষ মজুর ধর্মঘট করিয়া গর্জ্জন

তুলিয়াছে—উহাদের বাঁচাও। ধর্মঘটের পথে কত মজুর জীবন দিয়াছে, সাম্রাজ্যবাদের গুলি স্ত্রীলোকে পর্যন্ত হত্যা করিয়াছে। কিন্তু মৃত্যুহীন প্রতিজ্ঞায় মজুর শ্রেণির লক্ষ নরনারীর নির্ভয়ে গর্জ্জন তুলিয়াছে—আমাদের প্রাণ যায় যাক, উহাদের বাঁচাও।

উহাদের বাঁচাও—এই তাক আজ হাজার মাইল পার হইয়া কলিকাতার দুয়ারে আসিয়া আঘাত করিতেছে। কলিকাতার শ্রমিক ভাইদের কাছেই এই ডাক সবার চেয়ে আপনার। যাহারা মরিতে বসিয়াছে, তাহারা মজুর শ্রেণিরই আপন সন্তান। তাই লাল ঝান্ডা কাঁধে লইয়া বোম্বাইয়ের মজুর শ্রেণিই সবার আগে তাহাদের বাঁচাইতে বাহির হইয়াছে। কলিকাতার সমস্ত মজুর সে ডাকে সারা দিক, মজুরের বিক্ষুব্ধ গর্জ্জনে আকাশে বাতাসে কঠিন প্রতিবাদ বাজিয়া উঠুক—উহাদের মরিতে দিব না।

কলিকাতার বীর ছাত্র, হিন্দু মুসলমান লক্ষ লক্ষ নাগরিক। দশ হাজার ভাইয়ের জীবনের কাছে সমস্ত যুক্তি তর্ক, বাধা নিষেধ কোনো কিছুরই কিছুমাত্র মূল্য নাই। মৃত্যুর সীমান্ত হইতে যাহারা ডাক দিল, আপনাদের সতেজ জীবনে তাহার বিরাট প্রতিধ্বনি জাগুক। লক্ষ নাগরিকদের সক্রিয় ও সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ সংকল্প জানাক—উহাদের মরিতে দিব না। [পৃ. ৯৩][৮৪]

১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টের কলকাতার দাঙ্গা সম্পর্কে অমিতার (ফুলকি) মনে হয়েছিল—

১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টেই কলকাতার পথ নাগরিকদের রক্তে ভিজে যায়নি। যে ঘৃণা যে হিংস্রতা সেদিন ক্ষিপ্ত হয়ে কলকাতায় রক্ত ঝরিয়েছিল, তার সূচনা হয়েছিল ফেব্রুয়ারি মাসে। না, না, ১৯৪৫ এর নভেম্বর মাসে। রামেশ্বর সেই ঘৃণা ও সেই হিংস্রতারই বলি! [প্রতিবেশী, পৃ. ২৪১][৮৫]

ছাত্র-জনতার পাশাপাশি ১৯৪৬-৪৭ সালে শ্রমিক আন্দোলন শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় কিছু শ্রমিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, তা ক্রমশ জঙ্গি আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে। 'স্বাধীনতা' সংবাদপত্রের তথ্য অনুযায়ী—

কলকাতা ও শহরতলির শ্রমিকরা লাল ঝান্ডা ইউনিয়নগুলির ডাকে ব্যাপক সাড়া দিয়েছে। লক্ষাধিক শ্রমিক ধর্মঘট করেছে। শিয়ালদহ ও হাওড়ার রেল বন্ধ। সারাদিন ট্রাম চলেনি। লক্ষাধিক শ্রমিকের সঙ্গে হাজার ছাত্র এই ধর্মঘটে যোগ দিয়েছে। রেল স্টেশনে ও শহরে সর্বত্র মিলিটারি ও পুলিশের টহল। ধর্মঘটীদের মধ্যে রয়েছে খিদিরপুরের ব্রুকবন্ড ও লিপটন চা কারখানা, ভারতিয়া লোহা কারখানা, ম্যাকিনটোস বার্ন, এয়ার কন্ডিশনিং কর্পোরেশন, বেরুক কেমেন্স, অন্নপূর্ণা মেটাল ওয়ার্কস, ভারত ব্যাটারি প্রভৃতি কারখানার শ্রমিক, কর্পোরেশন ওয়ার্কশপের শ্রমিক, ধাঙ্গর ও মেথর কাজ বন্ধ করে। ইউনিয়ন নেতাদের বিশেষ অনুরোধে পাওয়ার হাউস ও পাম্পিং স্টেশনের শ্রমিকগণ ধর্মঘট থেকে বিরত থাকেন।

হাওড়ায় বেলুড় লোহা কারখানা, বেলুড় রেলওয়ার্কশপ, গোস্টকীন, টার্নার মরিসন, হ্যাত ফিল্ডস্, শালিমার পেন্টস্, শালিমার রোপ, ভিক্টোরিয়া স্টিল রোপ, পোট ইঞ্জিনিয়ারিং, এ. জে. মেন কোং, গ্যাঞ্জেস ইঙ্ক কোং-এর শ্রমিকরা ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে। [উত্তাল চল্লিশ, অসমাপ্ত বিপ্লব, পৃ. ৯৪][৮৬]

তৎকালীন সময়ে যে সমস্ত আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল সেগুলির বেশির ভাগই ছিল ইংরেজ শাসনজনিত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের পটভূমিতে। ফলে এই আন্দোলনগুলি ব্রিটিশ বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অভিযান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। পাশাপাশি একই সময়ে বাংলা তথা ভারতের হিন্দু-মুসলিম বর্গাদার খেতমজুর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সামন্ততান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। তবে এই আন্দোলনকে পুরোপুরি সংগঠিত করেছিল কমিউনিস্ট পার্টি। কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরাই গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে এই আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত স্বাধীন কৃষক আন্দোলনের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল তেভাগা আন্দোলন। ১৯৪৫-৪৬ সাল ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ সময়। এইসময় রাজনৈতিক জগতে নানা বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দেয়। আর প্রতি মুহূর্তে রাজনৈতিক জগতে নানা ভাঙা-গড়া হতে থাকে। শ্রমিক কৃষক-সেনাবাহিনীর জঙ্গি আন্দোলন-আজাদ হিন্দ বাহিনীর মুক্তি সংগ্রাম জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে এক

নতুন স্তরে উন্নীত করেছিল। এরপূর্বে ভারতের রাজনীতিতে জাতীয় আন্দোলন এতটা শক্তিশালী হয়ে ওঠেনি। এই বিষয়ে নরহরি কবিরাজ্যের মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য—

> শ্রমিক, কৃষকের জঙ্গী প্রতিরোধ, বিশেষ করে সেনাবাহিনীর বিদ্রোহ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে রীতিমত আতঙ্কিত করে তুলল। এই পর্যায়ের জঙ্গী আন্দোলনের মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার মৃত্যুঘন্টা শুনতে পেল। সে বুঝতে পারল আর আগের মত বল প্রয়োগের সাহায্যে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তাই তাদের নতুন কৌশলের আশ্রয় নিতে হল। [স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা, পৃ. ২৪১][৮৭]

তাদের লক্ষ্য ছিল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদকে চিরস্থায়ী করে তোলা। তাই তারা জিন্নার 'দ্বি-জাতিতত্ত্বের' সুযোগকে কাজে লাগিয়েছিল। কারণ মুসলিমদের মধ্যে কেউকেউ ইসলামের স্বার্থে জিগির তুলে 'লে কর রহেঙ্গে পাকিস্তান' এবং মুসলিম স্বার্থে নাড়াদিয়ে, ''লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'' স্লোগানে বাংলা তথা সমগ্র ভারত মুখরিত হয়ে উঠেছিল। এদের মূল বক্তব্য ছিল, 'পাকিস্তান আদায় করতে না পারলে মুসলমান ধ্বংস হয়ে যাবে।' 'প্রতিবেশী' উপন্যাসের তায়েব কাকা চরিত্রের মধ্য দিয়ে বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের দাবি-দাওয়ার কথা ব্যক্ত করেছেন—

> জিন্না হার্ড বার্গেনার। কিন্তু ক্যাবিনেট মিশন যা দিতে চাইছে, তার চাইতে বেশি আর তিনি কি পেতে পারেন? লাহোর প্রস্তাবে যা ছিল, ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবে তো সেটা মেনে নেওয়া হয়েছে বলাই যায়। প্রভিন্সিয়াল অটনমি, গ্রুপিং। সবই তো আছে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবে। কংগ্রেসেরই বরং অসুবিধা ছিল। অখণ্ড ভারতের জায়গায় ফেডারাল ভারত। কংগ্রেসও জোর দিয়েছে প্রভিন্সিয়াল অটনমির উপর। তিনটে গ্রুপ হবে। একটা হবে সিন্ধু বালুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে, যেটকে জিন্না বলছেন মুসলিম মেজরিটি আছে, সেটা নিয়ে একটা গ্রুপ। বাংলা আসাম নিয়ে পূর্বাঞ্চলে একটা গ্রুপ, আর ভারতের অন্যান্য প্রদেশগুলো নিয়ে একটা গ্রুপ। এটাতে মেজরিটি থাকবে হিন্দুরা। কেন্দ্রীয় অর্থাৎ ফেডারেল সরকারের হাতে ক্ষমতা থাকবে দেশরক্ষার, যোগাযোগ ব্যবস্থার, পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়াদির। [পৃ. ২৭৩][৮৮]

হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে ১৬ আগস্ট কলকাতায় নতুন করে দাঙ্গা শুরু হয়েছিল। সেই দাঙ্গায় দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল কলকাতা। এ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন 'শুধু ফুলকির প্রেম নয়, আরও অনেক কিছুই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল।' [পৃ. ২৮৫][৮৯] দাঙ্গার প্রসঙ্গে লেখক গৌরকিশোর ঘোষ লিখেছেন—

> আমরা বিশ্বাস করিনি মা, বাংলায় এমন সর্বগ্রাসী দাঙ্গা হবে। আরও অনেকবার কলকাতায় দাঙ্গা হয়েছে। দাঙ্গা হয়েছে ঢাকায়। বাংলার অনেক জায়গায় তো দাঙ্গা হয়েছে। কিন্তু এমন ভয়াবহ ব্যাপার আর কখনও দেখা যায়নি। মুসলমানদের প্রতি হিন্দু, হিন্দুর প্রতি মুসলমানের যেটুকু বিশ্বাস, যেটুকু আস্থা অবশিষ্ট ছিল সেটুকু পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গেল। তখনই বুঝে গিয়েছিলাম ফুলকি, দেশভাগকে আর রোখা যাবেনা। মনে মনে আমরা একেবারেই বিভক্ত হয়ে গিয়েছি। [প্রতিবেশী, পৃ. ২৮৫-২৮৬]

১৯৩৭ থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে মুসলিম লিগের দল ভারী হয়েছিল; এই সময় যাঁরা মুসলিম লিগের দলে ছিলেন, তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের যুবক শ্রেণি। এই সময়ের মধ্যে জিন্না মুসলমানদের মনে হিন্দু প্রভুত্ব এবং হিন্দু রাজত্ব সম্পর্কে প্রচণ্ড ভয় ঢুকিয়ে দিতে পেরেছিলেন। ভয়টা প্রথম দিকে ছিল উপরতলার, কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে তাঁদেরকে হিন্দুদের অধীনেই বাস করতে হবে, ফলে তাঁদের স্বার্থহানি ঘটবে। এর পর ধীরে ধীর ভয়টা ছড়িয়ে পড়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমানদের মধ্যে। কারণ তাঁরা ভয় পেয়েছিলেন চাকরি-বাকরি পেশা ইত্যাদির ব্যাপারে হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তারা এঁটে উঠতে পারবেন না। কাজেই তাঁরা জিন্নার বিভেদনীতির মধ্যে, দ্বিজাতিতত্ত্বের মধ্যে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিলেন। শিক্ষিত মুসলমানেদের অধিকাংশেরই ধারণা ছিল যে, কংগ্রেসের রাজত্ব মানেই হিন্দু রাজত্ব। আর হিন্দু রাজত্ব মানেই মুসলমানেদের সর্বনাশ। জিন্না রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে মুসলমানদের মনে হিন্দু আধিপত্য এবং ইসলাম ধর্ম বিপন্ন হয়ে পরবার ভয় ঢুকিয়ে

দিতে পেরেছিলেন। অন্যদিকে পাকিস্তান রাষ্ট্র দাবির পিছনে হিন্দুরা প্যান্-ইসলামের জুজু দেখতে পেয়েছিল। এর মধ্যে শেষ ধাক্কাটা দিলেন জওহরলাল নেহরু। তখন তিনি কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেন, ওয়াভেল অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করলে, সেই সরকারের প্রধান মন্ত্রী হবেন তিনিই। অন্যদিকে জিন্না ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট ডিরেক্ট অ্যাক্শন ঘোষণা করলেন। লেখক উপন্যাসটিতে দাঙ্গার সময়ের কলকাতার বিবরণ দিয়েছেন—

> দাঙ্গায় সওয়ার হলে কলকাতায় মৃত্যু এসে হানা দিয়েছিল, নরকের অশরীরী ঘোড়াগুলো আমাদের মনের তলদেশ থেকে উঠে এসে প্রেম ভালবাসা করুণা দয়া মায়া বিশ্বাস যুক্তি বুদ্ধি, যা নিয়ে মানুষ বাঁচে, সব কিছুকে তাদের হিংস্র খুরে গুঁতিয়ে মাড়িয়ে দলে থেঁতলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রাস্তায় রাস্তায় মহল্লায় মহল্লায়। সেই ঘোড়াগুলোর চেহারা কি? [প্রতিবেশী, পৃ. ৩৪০][৯১]

ছেচল্লিশ সালের দাঙ্গায় কলকাতায় চারদিনে কুড়ি হাজার নরনারী শিশু হতাহত হয়েছিল। এই দাঙ্গার আগুন প্রথমে কলকাতা পরে নোয়াখালি, তারপর বিহার এবং বিহারের পর গড়মুক্তেশ্বরে ছড়িয়ে পড়েছিল। ছেচল্লিশের এক বছর পরে ভারতবর্ষের খণ্ডিত স্বাধীনতা প্রাপ্তি দ্বিজাতিত্ত্বের ভিত্তিতে। এ প্রসঙ্গে অন্নদাশংকর রায়-এর হিন্দু-মুসলিম রাজনীতির সম্বন্ধে বিশ্লেষণটি এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—

> হিন্দু হিন্দুই থাকবে, মুসলমান মুসলমানি থাকবে, দুই জুড়ে গিয়ে এক ভারতীয় হবে এতত্ত্ব কার্যত পরাহত হয়েছে। হিন্দুকে সেকুলার হতে হবে, মুসলমানকে সেকুলার হতে হবে, সেকুলারের সঙ্গে সেকুলার মিলে এক হবে, এর জন্যে যদি দু'তিন শতক সময় লাগে তো সেটাও এমন কিছু বেশি সময় নয় আমাদের পাঁচ হাজার বছরের সুদীর্ঘ ইতিহাসে। ব্যক্তিগত জীবনে যে যা খুশি হোক, কিন্তু সমষ্টিগত জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতাই শ্রেয়। জিন্নাও এটা জানতেন, কিন্তু তাঁর দলবলের হিন্দু ভীতি ও ইংরেজ প্রীতি তাঁকে মুখ্য স্রোত থেকে পৃথক স্রোতে চালিত করে। দেশভাগের পর চেতনা হয়, কিন্তু সেই পৃথক স্রোতের শক্তি তাঁর ব্যক্তিগত শক্তির চেয়ে প্রবল। গান্ধীজীর কাছে যিনি হার মানলেন না, তিনি মোল্লাদের কাছে মানলেন। বেঁচে থাকলে মিলিটারির কাছেও মানতেন। পাকিস্তান পড়ে মোল্লা মিলিটারির যৌথ কবলে। পূর্ব পাকিস্তান মুক্তি পায়। কিন্তু পরে তারও একই পরিণতি, মুক্তিদাতা মুজিব নিহত।
>
> ভারতীয় মুসলানদের শিকড় যে ভারতে, পাকিস্তানে নয়, আরবে নয়, ইরানে নয়, মধ্য এশিয়ায় নয় এটা উপলব্ধি করতেও আরো সময় লাগবে। আর হিন্দুদেরও হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে ভারত আর হিন্দু একার্থক নয়, ভারত হিন্দুর চেয়ে বড়ো, হিন্দুর চেয়ে পুরাতন, আর্যের চেয়েও প্রাচীন, বেদের চেয়েও আগেকার। অগ্রাধিকার যদি কারো থাকে তবে তা আদিবাসীদের। তারাই এদেশের রেড ইন্ডিয়ান। তারাই আদি ভারতীয়। হিন্দু নয়। সবাইকে হিন্দু বানাবার উদগ্র বাসনা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ নয়। জিন্না প্রমুখ ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের আত্মীয় না করে পর করে দেয় ভারতীয় জাতীয়তাবাদের হিন্দু পুনরুজ্জীবকামী শাখা। প্যান-ইসলামিজমের মতো প্যান-হিন্দুইজম্। জিন্নার কংগ্রেস ত্যাগের পশ্চাতে সেটাও কাজ করছিল। ভারতীয় হতে হলে হিন্দু হতে হবে এমনতর দাবী কেউ করেনি। [জিন্না/পাকিস্তান নতুনভাবনা; শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমিকা, পৃ.৭][৯২]

দেশভাগের ট্র্যাজেডির কথা বলতে গিয়ে উপন্যাসে অমিতা বলেছে—

> জিন্না পাকিস্তান চেয়েছিলেন, জিন্না পাকিস্তান পেয়েছিলেন, মুসলমানদের একটা অংশ, বড় অংশই, পাকিস্তান চেয়েছিল। ভেবেছিল সেটা হবে তাদের পবিত্র স্থান। যাঁরা পাকিস্তান চেয়েছিলেন, তাঁরা পাকিস্তান পেয়েও গেলেন। কিন্তু যে পাকিস্তান তাঁরা কামনা করেছিলেন, যে পাকিস্তানের স্বপ্ন তাঁরা দেখেছিলেন, সেই পাকিস্তান কি তাঁরা পেলেন? [পৃ. ৩৩১][৯৩]

কিন্তু ভারতের মুসলমানরা মাইনরিটিই থেকে গেল। স্বাধীনতার পরেও সাম্প্রদায়িকতা, ঘৃণা, বিদ্বেষ, দাঙ্গা, হানাহানি সবই রয়ে গেল। যারা জিন্নার দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছিল, তারা সবাই এমন পাকিস্তানে মোহাজির। অর্থাৎ উদ্বাস্তু। সেই প্রসঙ্গেই উপন্যাসে অমিতার তায়েব কাকা হরিকিশোর মহাশয়কে বলেছিলেন—

ভারত তো তবু স্বর্গ। পাকিস্তানের কোনও খবর রাখ? পাকিস্তান এখন দোজকিস্তান হয়ে উঠেছে। ভারতে এখনও মুসলমানে হিন্দুতে সেই পুরনো দাঙ্গা কোথাও কোথাও হচ্ছে। কিন্তু পাকিস্তানে দাঙ্গা হচ্ছে মুসলমানে মুসলমানে। মুসলিম বেরাদরির পালিশ এইমাত্র এই কয় বছরের মধ্যেই ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে গিয়েছে। সব চাইতে খারাপ অবস্থায় পড়েছে বিহার ইউ.পি.র সেই সব মুসলমান যারা চেয়েছিল ''লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'। এখন তাদের কেউ আর পাকিস্তানি নয়। [পৃ. ৩০২][৯৪]

অর্থাৎ স্বাধীনতা সংগ্রামের সুর খুব উঁচু তারে বাঁধা হলেও তার থেকে স্খলন পতন মানবিক নিয়মেই ঘটেছে।

ট্রিলজি উপন্যাস ছাড়াও লেখকের অন্যান্য উপন্যাস, বিশেষ করে 'মনের বাঘ'; 'লোকটা', 'গড়িয়াহাট ব্রিজের উপর থেকে, দুজনে'; 'কমলা কেমন আছে' উপন্যাসগুলিতে স্বাধীনতা পরবর্তী রাজনৈতিক ভাঙা-গড়াকে লক্ষ করা যায়। উপন্যাসগুলি প্রায় ষাট সত্তরের দশকে প্রকাশিত। স্বাধীনতার প্রাপ্তির পরও সমাজে মানুষের অবস্থান আজও অস্থিরতাময়। কারণ, স্বাধীনতার দুই রাষ্ট্রে উদ্বাস্তু সমস্যা তৈরি করেছে। স্বাধীনতার পর হিংসা-দ্বেষ-বিদ্বেষ-নারী ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটে চলেছে। কিন্তু সেটা নতুন কিছু নয়, কারণ ইতিহাসের দিক চেয়ে দেখলে দেখা যাবে যে আবহমান কাল ধরে রাষ্ট্র পরিবর্তনকালে ধর্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তাকেই সংবাদ সংস্থা হেডলাইন করেছে সংবাদ পত্রে। কিন্তু এর পিছনের রাজনৈতিক ইতিহাসকে অর্ধেক চেপে রেখে অর্ধেক প্রকাশ করেছে। তাই 'মনের বাঘ' উপন্যাসটিতে প্রথমেই দেখতে পাওয়া যায় যে, উপন্যাসের কথক এবং রঙ্গচারী খবর সংগ্রহ করতে গেছে; মধ্যপ্রদেশের এক রুক্ষ অরণ্যে। উদ্বাস্তু বসতের সুযোগ করে দিতে এবং অরণ্যের আদিম অধিবাসীদের কীভাবে উৎখাত করা হচ্ছে তার তথ্য সংগ্রহ করতে। এরই মধ্যে সুশীলা রঙ্গচারীকে বলেছে—

ভূখণ্ডের শাসক পরিবর্তনকে যদি স্বাধীনতাই বলো। স্বাধীনতার জন্য দেশভাগ হল, তাতে কী হয়েছে? তা বলে তোমাকে ঘড়বাড়ি ছেড়ে চলে আসতে হবে?

কী করে থাকবে, যদি অত্যাচার হয়, নারী ধর্ষণ হয়?

এখানে হচ্ছে না অত্যাচার? ধর্ষণ হচ্ছে না? এখান থেকে লোকে কি পালিয়ে যাচ্ছে? অত্যাচারের জন্য পালিয়ে আসেনি, ধর্ষণের জন্য পালিয়ে আসেনি। পালিয়ে এসেছে ভয়ে। ভয় অত্যাচারের চেয়েও বেশি বিভীষিকাময়। ক্লৈব্য সব থেকে মারাত্মক। ওরা যদি মার খেত, মারত, তবে ভয় ভেঙ্গে যেত। এখানে যারা পালিয়ে এসেছে, তাদের কিছু এসেছে স্বার্থ বাচাতে, বেশির ভাগ এসেছে ভয়ে। অল আর ডেড বডিজ। ডোন্ট সে এনিথিং অ্যাবাউট রেপ। ....ইতিহাসের দিকে চেয়ে দ্যাখো, আবহমানকাল ধরে রাষ্ট্র পরিবর্তন কালে ধর্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বহু বাস্টার্ডের জন্ম হয়েছে। পৃথিবী কি ভেঙ্গে পড়েছে? সভ্যতা কি পিছিয়ে পড়েছে? এক অর্থে আমরা সবাই জারজ। আমাদের উত্তরাধিকার জারজদের উত্তরাধিকার। এই সভ্যতায় নির্ভেজাল রক্ত কার আছে? ধর্ষণ অন্যায়, পাপ—আই নো, আই নো। কিন্তু কোন জাতির জীবনে আতঙ্কগ্রস্ত হবার মত ঘটনা এটা নয়? ডোন্ট সে অল দিস রাবিশ টু মি। ইট ইস লাইফ দ্যাট ম্যাটারস্ নাথিং এল্স্। বাঁচো, মানুষের মত বাঁচো। অ্যান্ড হোয়ার ইজ লাইফ, ম্যান? কে বেঁচে আছে? নাইদার ইউ নর আই। আমরা মৃতদেহ, আমাদের শহর-গ্রাম কবরখানা, আমাদের ঘরবাড়ি সব কফিন। কে বেঁচে আছি? কেউ না। তুমি আমি—কেউ না। আমি তা জানি, তা জানি। সিক্স্টি মেন অ্যাট ডেড্ম্যাননস চেস্ট্। [পৃ. ৯৩-৯৪][৯৫]

শুধুমাত্র মধ্যপ্রদেশের রুক্ষ অরণ্যভূমি নয়, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে কলকাতার জনজীবনেও এক স্থাবরতা প্রাপ্তি ঘটেছিল। তার প্রমান পাওয়া যায় লেখকের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে—

ভয় ভয় ভয়। সন্দেহ নেই, কলকাতার পুরনো ভিতে ভয়ের উইপোকা লেগেছে। আমাদের জীবনের মর্মস্থলে উই ধরেছে। ভয় ভয় ভয়। ভয় আমাদের গ্রাস করেছে। লক্ষ লক্ষ জীবন্ত মৃতদেহ ভিড় করে আছে কলকাতা নামক কারখানায়। সেই লাশগুলো নড়ে চড়ে কথা বলে। আহার নিদ্রা মৈথুনে কাল কাটায়। সিক্স্টি মেন অ্যাট ডেড্ম্যান্স্ চেস্ট্, ষাটজন নয়, ষাট লক্ষ, ষাট লক্ষ নয়, প্রায় দু কোটি লোক পশ্চিমবঙ্গ নামক মৃতমানুষের

সিন্দুকে বাস করে। ভয়ে ভয়ে থাকে। আর আতঙ্গে চেঁচায়। গেল, গেল, সব গেল। আর ঘুমায়। ওদের দেহ ঘুমায়, ওদের মন ঘুমায়, ওদের মস্তিষ্ক ঘুমায়, ওদের পাকস্থলী ঘুমায়। বুদ্ধি বিচার বিবেচনা ঘুমায়। ঘুমায় আর আতঙ্গে চেচাঁয়। গেল, গেল, সব গেল। ওরা মৃত, তাই নিজেরা কিছু করে না, করতে চায় না, ঝুঁকি নেয় না। খালি চেঁচায়, আমরা বঞ্চিত, আমরা বঞ্চিত। ওরা মৃত, ওদের তাই বাঁচার তাগিদ নেই। ওরা মৃত, মরার ঝুঁকিও ওরা নিতে চায় না।

এই উদ্বাস্তুরা এদেরই বংশধর। অনেক ঢাক ঢোল পিটিয়ে, বন কেটে জমি বানিয়ে কৃত্রিম সারে জমি উর্বরা করে আমরা মৃত বীজ বুনে চলেছি আর সেই জমি থেকে তাজা ফসল চাইছি। এই আমাদের ট্র্যাজেডি অথবা চরম প্রহসন। নপুংসকের কাছে চাইছি বীর্যবান সন্তান। [মনের বাঘ, পৃ. ৯৪][৯৬]

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের শহর-শহরতলি এমনকি গ্রামের মানুষগুলি স্থবির এবং প্রায় মৃত প্রায়ে পরিণত হয়েছিল। শিয়ালদা স্টেশনের আদল ক্রমে ক্রমে বদলে যেতে লাগল। কলকাতার চরিত্রও ধীরে ধীরে বদলাতে লাগল। এখন শুধু পড়ে আছে শুধু স্মৃতি, যা অজর, অমর, অব্যয়, অক্ষয় এবং অবিনশ্বর। উপন্যাসটিতে লেখক তার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন—

লক্ষ পুত্রের জননী কলকাতা দারিদ্র্যের পীড়নে পিষ্ট, পুরনো বনেদিয়ানা ভেঙ্গে পড়েছে তবু তারই স্মৃতি সম্বল, বুকে দুধ নেই, সংসারে তিলধারণের জায়গা নেই, কারও পুষ্টি নেই, পরনে লাল-পেড়ে ছেঁড়া শাড়ি শাঁখামাত্র সার তবু কী অসাধারণ স্নেহ! কাউকে ফেরায় না, কাউকে তাড়ায় না। কাছে এগিয়ে গেলে সস্নেহে স্নান করায় .... [পৃ, ১৩২][৯৭]

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে পসিচমবঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠেছে উদ্বাস্তু কলোনি। আর খেতে না পাওয়া মানুষের ভিড়, কঙ্কালসার ক্ষুধার্ত মানুষেরা শিয়ালদহ স্টেশন থেকে শুরু করে ভিড় করেছে শহর শহরতলি ছাড়িয়ে গ্রামে গঞ্জে। উদ্বাস্তু ক্যাম্পের কথা লেখক তুলে ধরেছেন উপন্যাসে সরস্বতী চরিত্রটির মধ্য দিয়ে—যে ছোটো বেলা থেকেই বিভিন্ন ক্যাম্পে ঘুরে ঘুরে মানুষ হয়েছে। শুধুমাত্র সরস্বতী নয়, সরস্বতীর মতো এমন অসংখ্য মানুষ আছে, স্বাধীনতা যাদের মাথার উপর থেকে ছাদ কেড়ে নিয়েছে। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে যাদের স্থায়ী আস্থানাও হারিয়ে গেছে। বা তাদের কারো কারো জন্ম হয়েছে উদ্বাস্তু ক্যাম্পেই। যেমন সরস্বতীকে জিজ্ঞাসা করলে সরস্বতী বলে—

সরস্বতী তোমার দেশ ছিল কোথায়?

কে জানে। ছেলেবেলা থেকেই ধুবুলিয়া ক্যাম্পে ছিলাম বাবা মরে গেল। মা কোথায় চলে গেল। একটু বড় হতেই রানাঘাটের কুপার্স ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিলে। তারপর পি এল ক্যাম্পে। [পৃ. ৯৭][৯৮]

স্বাধীনতার সময় বলা হয়েছিল 'পাকিস্তান হইছে মিয়াগ লাইগ্যা হিন্দুস্তান হিন্দুগ লাইগ্যা।' পাকিস্তানে থাকলে হিন্দুগ জাত ধরম কিছু থাকবে না।' দুলুর মতো অনেকেই পাকিস্তান থেকে চলে এসেছে নিজেকে নয়, জাতকে বাঁচাবার জন্য। লেখক বলেছেন—

দুলু পাকিস্তানে থাকলে নিজেকে বাঁচাতে পারত। সে নিজের জন্য আসেনি। জাতকে বাঁচাবার জন্য ভিটেমাটি ছেড়ে উঠে এসেছে। একটা আস্ত মানুষ হাঁটুভাঙ্গা উদ্বাস্তু হয়েছে, আসাম থেকে বাঙালিরা আসছে, নিজেকে বাঁচাতে নয়, নিজেকে বাঁচাতে অনেকেই পারত, এখনও পারে, ওরা আসছে বাংলা ভাষার ইজ্জত বাঁচাতে। এক ব্যাধি সর্বত্র ঢুকেছে। মানুষ ভাবছে না, সে মানুষ। ভাবছে না, তাকে নিয়ে জাতি, তার জন্যই ভাষা। ভাবছে সে জাতির অস্তিত্বহীন একটা সংজ্ঞার-অংশ। সে বাঙালি, সে অসমিয়া, সে হিন্দু, সে মুসলমান, সে ভারতীয়, সে পাকিস্তানি—কিন্তু সে রক্তমাংসের, চোখ কান নাক মুখ মস্তিষ্ক মেরুদণ্ড হাত পা পাকস্থলী জননেন্দ্রিয় বিশিষ্ট একটা ব্যক্তি—একটা দুলু নমঃশূদ্রই শুধু নয়। দুলু নমঃশূদ্র যদি দুলু নমঃশূদ্রই থাকত, তা হলে তাকে জন্মভিটে ছেড়ে চলে আসতে হত না। তার অধিকার বজায় রাখার জন্য সে দাঙ্গা করত, মরত নয় জেল খাটত, কিন্তু আকার-অবয়বহনী আর একটা সংজ্ঞা—উদ্বাস্তু হত না। [পৃ. ১০০-১০১][৯৯]

এক্ষেত্রে প্রাবন্ধিক অন্নদাশংকর রায়ের ভারত ভাগ সম্পর্কে তাঁর রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এখানে বিশেষভাবে স্মরণ করা যেতে পারে—

> ভারত ভাগ কার্যত হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়কেই বিকলাঙ্গ করে দিয়েছে। ভেঙে চুরে দিয়ে জোড়া লাগবার জন্য প্রস্তাব আসে লোক বিনিময়ের।
>
> কংগ্রেস রাজি নয়। লিগও নারাজ। সুতরাং লোক বিনিময় বেসরকারিভাবে চলতে থাকে।
>
> পশ্চিম পাকিস্তান ছেড়ে হিন্দু এবং শিখরা প্রায় সকলেই ভারতে চলে আসে দু-এক মাসের মধ্যে। দিল্লিতে দারুণ শরণার্থী সমস্যার সৃষ্টি হয়। অপরপক্ষে পূর্ব পাঞ্জাব এবং উত্তর ভারতের মুসলমানরা দলে দলে পাকিস্তান রওনা হয়ে যায়। অনুরূপ ঘটনা পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গেও ঘটতে পারত। কিন্তু মহাত্মা গান্ধি পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের উপদেশ দেন দেশত্যাগ না করতে এবং পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের অভয় দেন। পূর্ববঙ্গের তৎকালীন সরকার যদিও লিগ সরকার তবুও তারা লোক বিনিময়ের বিপক্ষে ছিল। ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুরা এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে মুসলমানরা খুব কমই পেরেছে ধর্ম অনুযায়ী যার যার জায়গায় চলে যেতে এবং আসতে। আসলে বিভাগটা রাজনৈতিক। [নব্বই পেরিয়ে, পৃ. ৭৪]

উদ্বাস্তু সমস্যার পাশাপাশি দেখা দিয়েছে খাদ্য সঙ্কট, রেল-শ্রমিক ও নানা কলকারখানার শ্রমিকদের ধর্মঘট। এই রকম এক অবস্থার চিত্র দেখতে পাই উপন্যাসটিতে—

> রেশন নিয়ে বড় গোলমাল হচ্ছে। আটা বা দিয়েছে এবার, একদম গন্ধা। রেশন স্টোরে যারা কাজ করছে, তারা চোর। ওজনে কম দিচ্ছে। বাড়ি এনে সে জিনিসগুলো পাল্লায় ওজন করেছি, চিনি কম, আটা কম, দু দু ছটাক চাল কম। আর কী কাঁকর! এরকম চলবে তো বাঁচব কী করে? আমাকে এসব অভিযোগ পেশ করতে বলল কোম্পানির কাছে। আজ ইউনিয়ন-অফিস খোলাই হয়নি। সতেরোটা দাবি করেছি আমরা। অনবরত দরবার চলেছে। রেল-শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। দরবারে কিছু হবে না। চাক্কা বন্ধ করতে হবে। আমরা যুদ্ধ সমর্থনের নীতি নিয়েছি। এখন ধর্মঘট করলে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা ব্যাহত হবে, আমাদের সংগ্রামের পন্থা দরবার করা। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কমিউনিস্ট ইউনিয়ন। কমিউনিস্টরা যুদ্ধ সমর্থন করছে। ... আমরাও এ যুদ্ধ সমর্থন করি। আমরা আর কমিউনিস্টরা প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী—ঘৃণ্যতম শত্রু। .... আমরা সাম্রাজ্যবাদের দালাল, কমিউনিস্টরা রাশিয়ার দালাল।... [পৃ. ১১২-১১৩][১০১]

স্বাধীনতার পর দেশের মধ্যে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে একটা আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ তৈরি হয়। এই অবস্থায় লাল ইউনিয়নের, জঙ্গি রেল-শ্রমিক ইউনিয়নের গোপন সভায় গৃহীত চরম প্রস্তাব হল ''সামগ্রিকভাবে যুদ্ধ প্রচেষ্টা সমর্থন এবং আঞ্চলিক ভাবে, দাবি আদায়ের চাপ সৃষ্টির জন্য সাময়িক ধর্মঘট।" [পৃ ১১৩][১০২]

এর পক্ষে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে যুক্তি ছিল যে—

১। শ্রমিক-শক্তির আস্থা কমিউনিস্টদের উপর থাকবে।

২। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির নাশকতামূলক চক্রান্ত ব্যর্থ হবে।

৩। কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব জনগণের মধ্যে বৃদ্ধি পাবে।

৪। ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী কমিউনিস্ট পার্টির শক্তির পরিচয় পাবে।

দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রেল শ্রমিক ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট পার্টির ইউনিয়নের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের দাবি দাওয়ার আলোচনার চিত্র লেখক দেখিয়েছেন উপন্যাসটিতে—

> আমাদের ইউনিয়ন চাক্কা বন্ধের প্রস্তুতিতে মেতেছে। কর্তৃপক্ষ সামান্যতম দাবিও মানতে রাজি নন। কমিউনিস্ট ইউনিয়নের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। কমিউনিস্টরা ধর্মঘটের প্রস্তুতিতে মেতে উঠেছে। তারা শ্রমিকদের হাতে রাখতে চায়। আমরা শ্রমিকদের হাতে রাখতে চাই। আমরা ধর্মঘটের প্রস্তুতিতে মেতে উঠেছি। কমিউনিস্টরা উপরওলার চরম নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছে। আমরা উপরের চরম নিদেশে জন্য অপেক্ষা করছি। [পৃ. ১২৮][১০৩]

ক্রমে শ্রমিকশক্তি দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে কেন্দ্রে রেখে হামজা বলেছিল—

> ১৯৩৯ সালে ভেবেছিলাম, হিটলার ঘাতক, ১৯৫০ সালে ভেবেছিলাম, স্তালিন সভ্যতার শত্রু। এখন সবই মায়া বলে মনে হয়। যেমন বর্তমান কংগ্রেসি শাসকদের কাছে গান্ধী-দর্শন মতিভ্রম মাত্র। মানুষের দুনিয়ায় সবই সম্ভব। [পৃ.১৪১][১০৪]

অর্থাৎ নীতি-ফিতি কিছুই নয়, সব লড়াইয়ের মূলে আছে পলিটিক্স আর পলিটিক্সের মূলে আছে পার্সন্যাল ইগো।

ষাটের দশকের শেষের দিকে ট্রেড ইউনিয়নগুলোও মালিকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে, পাশাপাশি ছাত্র-সংগঠনও বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাদের দাবি-আদায়ের চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়। তৎকালীন সময়ের রাজনৈতিক পরিবেশে দুর্নীতির কেন্দ্রীভবন, কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের ঔদ্ধত্য, পার্টির অবক্ষয় সর্বব্যাপী এক আমলাতন্ত্র এবং শহরে—শিল্প ভিত্তিক-মাফিয়া ক্ষমতাজালের শীর্ষে অধিষ্ঠিত এক ব্যবসায়ী শ্রেণির উদ্ভব। এই ধরনের ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন কোম্পানিগুলিতে মালিক ও শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে সংঘর্ষ তৈরি হয়। ফলে কোম্পানিগুলিতে মালিক পক্ষ শ্রমিকদের যখন তখন চাকরি থেকে ছাঁটাইয়ের নোটিশ ধরিয়ে দিতে লাগল এবং কোম্পানিগুলো যখন-তখন বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। যেমন—'লোকটা' উপন্যাসে তারই চিত্র আমরা দেখতে পাই—

> নোটিসটা এল টিফিনের পরে। কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন, বর্তমান সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে কোম্পানিকে বাঁচাতে হলে মরিয়া হয়ে ব্যয়সংকোচ এবং সেই সঙ্গে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও পন্থা নেই। তাই কোম্পানি এবং তার কর্মীদের স্বার্থে ব্যয় সংকোচের প্রথম সোপান হিসাবে ওভারটাইম বন্ধ করে দেওয়া হল এবং কর্মীরা যাতে হাতের জমানো কাজ শেষ করে যেতে পারেন সেই জন্য কাজের সময় এক ঘন্টা বাড়িয়ে দেওয়া হল। কোম্পানি আশা করছে যে, কর্মীরা এই ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবে। [পৃ. ২১৫][১০৫]

এই খবর শোনার পর কোম্পানির কেরানি কুল মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এটি শুধুমাত্র লোকটি উপন্যাসেরই চিত্র নয় তৎকালীন বাংলার সামগ্রিক চিত্র। কারণ ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের আগের দুই বছর ধরে খরা, গুরুতর খাদ্য ঘাটতি শিল্পোৎপাদনে সংকোচন, টাকার অবমূল্যায়ন এবং বিভিন্ন রাজ্যের কংগ্রেস সরকারের কাজের খতিয়ান নিয়ে বিরোধী-রাজনৈতিক মহলে কিংবা সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমশ বেড়ে চলেছিল। কোম্পানির কর্মচারী ইউনিয়নগুলো কথায় কথায় মালিক পক্ষকে ঘেরাও করতে তৎপর হয়ে ওঠে। আবার মাঝে মাঝে দেখা যায় মালিক ও শ্রমিকের দ্বন্দ্বে কারখানায় বা কোম্পানিগুলো অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হয়ে যেতে দেখা গেছে। মালিক পক্ষ ও শ্রমিকের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখতে পাই আলোচ্য উপন্যাসটিতে—

> ওভারটাইম আমাদের দিতে হবে।
>
> .... ওভারটাইম করব বলে আমরা দাবি তুলতে পারি না।
>
> আমরা বরং এই দাবি তুলতে পারি, আমরা বাড়তি বেগার খাটব না। অতিরিক্ত কাজ করলে তার মজুরি দিতে হবে। [পৃ. ২১৬][১০৬]

'গড়িয়াহাট ব্রিজের উপর থেকে, দুজনে' উপন্যাসটিতে যে রাজনৈতিক ক্ষেত্র দেখতে পাওয়া যায় তা 'লোকটা' উপন্যাসের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপূর্ণরূপ। উপন্যাসটিতে 'যজ্ঞেস্বরের রাজ্যসূয় এবং তার শ্রেণী চেতনা ঙ্ম (ওর জবানী)' অংশটির বর্ণনা অংশে আমরা দেখতে পাই যে, শ্রমিক শ্রেণীর নানা অবস্থার কথা। সেখানে বলা হচ্ছে—''পুজোর মুখে আফিসে প্রতি বছর একটা উত্তেজনা সৃষ্টিকারী পরিবেশের সৃষ্টি হয়। কোনও কোনও বার শোনা যায় এবার আর চালাকি নয়, নির্ঘাত স্ট্রাইক হবে। এবার আট মাসের বোনাস হয় ঘরে আসবে, আর না-হয় আট মাস কোম্পানির চাকা চলবে না। এখানে বলে রাখা ভাল, কোম্পানির বিলডিং ব্রেবোর্ন রোডে শিট পাইলিং করা ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত। চাকার উপর নয়। অতএব চাকা চলবে না কথাটার অর্থ কাজ চলবে না, এই অর্থেই ধরে নিয়েছিলাম।" [পৃ. ২৪৬][১০৭] অন্যদিকে যজ্ঞেশ্বর কারখানার এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের জেনারেলর সেকরেটরি, সে শ্রমিকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলত—

আপনারা এককাট্টা হয়ে আমার পিছনে এসে দাঁড়ান, দালালি করে নিজেদের বিপদ ডেকে আনবেন না, দেখুন, এই সংগ্রামে জয় আমাদেরই হবেই। কোম্পানিকে আমি ভয় করিনে, ভয় করি দালালদের, তাদের ঘৃণা করি। মিডল ক্লাস, মানে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বিশ্বাস করিনে আমি। ওরা পেটি বুরজোয়া। শ্রেণীগতভাবেই সুবিধাবাদী। এই পেটি বুরজোয়া শ্রেণীকে নিয়ে সংগ্রাম করা এবং সেই সংগ্রামে জয়লাভ করা খুবই শক্ত। [পৃ. ২৪৫][১০৮]

স্বাধীনতার পর বেশ কিছু কাল পশ্চিমবাংলার শ্রমিক আন্দোলন ছিল অনড় ও নিথর। কিন্তু ১৯৬৩ সালের শেষ দিক থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত শ্রমিক আন্দোলন পশ্চিমবাংলার শ্রমিক ধর্মঘটে মরা গাঙে জোয়ার নিয়ে এল। আর তারই প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই আলোচ্য উপন্যাসটিতে। শ্রমিকদের উপর পুলিশের লাঠি, ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে রুল প্রয়োগ এবং ধর্মঘট বে-আইনি ঘোষণা প্রভৃতি ঘটনা পশ্চিমবাংলার তৎকালীন রাজনৈতিক পরিবেশকে উত্তপ্ত করে তুলেছিল। এরই মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ্যে দুভাগে হয়ে যায়। ভারত তথা পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে তখন শুধুমাত্র অস্থিরতার ঢেউ লক্ষ করা যায়। 'কমরেডদের মর‍্যাল স্ট্রেংথ বেশ খানিকটা কমে গিয়েছিল। উপন্যাসের বর্ণনা থেকে উঠে আসে-পার্টি অফিস পোড়ানোর খবর। উপন্যাসটিতে প্রাক্তন সংগ্রামী মন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়—''কলকাতার আইন শৃঙ্খলা ধ্বংসের পিছনে কেন্দ্রের সুস্পষ্ট হাত আছে। খুনোখুনি রক্তারক্তি, এটা নূতন কিছু নয়, এটা বৈদিক যুগ থেকেই চলে আসছে।" [২৮২][১০৯]

অন্যদিকে মার্কসের মূল কথাই ছিল—'পাওয়ার কাম্‌স আউট অব্ দি ব্যারেল অব্ দি গান। নলই শক্তির উৎস অতএব ওঠো, জাগো! শক্তির উৎসকে জাগ্রত করো।' [পৃ. ২৮৯][১১০] ক্রমবর্ধমান ভ্রাতৃঘাতী হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা। এসব মিলে পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে এক অস্থির সময়ের চালচিত্র দেখতে পাওয়া যায়। উপন্যাসটিতে লেখক সে চিত্রই অঙ্কন করেছেন উপংসহারে—

আজকের কলকাতায় এগারো বছরের ছেলে অম্লান বদনে ছুরি চালায়, চোখের পাতা একবারও কাঁপে না, পনেরো-ষোলো বছরের কিশোরী ফাঁদ পেতে শিকার ধরে, শ্রেণীশত্রুর গলার নলি দু'ফাঁক করে দেবার জন্য সোৎসাহে ছুরি এগিয়ে দেয়। এখানে চেহারা দেখে কে খুনে নয় তা বোঝা যাবে, এতই সোজা! আমি মশাই, যুক্তিশাস্ত্র অনুসরণ করে চলি। আই আজকের কলকাতায় আমার কাছে সবাই খুনে। হয় সে নিজেই খুন করছে আর না-হয় কোনও না কোনও ভাবে খুনেদের মদত দিচ্ছে। [পৃ. ৩০৮][১১১]

এরই সাথে পশ্চিমবাংলার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নকশালবাড়ি আন্দোলন। নকশালবাড়ি আন্দোলন মূলত জোতদারদের বিরুদ্ধে অর্থাৎ কৃষকদেরকে জোর করে জমি থেকে উচ্ছেদ করার জন্য ভূমিহীন কৃষকেরা এক সাথে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। তারা স্লোগান তুলেছিল 'লাঙ্গল যার জমি তার'। আবার গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার শ্লোগানে পাহাড় থেকে সমতল পর্যন্ত মুখরিত হয়ে উঠেছিল। এই আন্দোলনটি শুধুমাত্র কৃষকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কৃষকদের মধ্য থেকে শুরু হয়ে ক্রমশ তা ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন সাধারণের মধ্যে। ছাত্ররাও এই আন্দোলনে যোগদান করেছিল। কলকাতা- শহরতলি-গ্রামে এই আন্দোলনের আঁচ বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন 'কমলা কেমন আছে' উপন্যাসটিতে এসেছে নকশাল আন্দোলনের কথা, এসেছে বৈবাহিক সম্পর্কের কথা, এসেছে নারী ধর্ষণের মতো কাহিনি, ধর্ষণকামী নারীর নিজের এবং সমাজের সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই ও সেই নারীর মনস্তাত্ত্বিকতা। একই সঙ্গে অবৈধ সন্তানের জন্ম দেবার সিদ্ধান্ত। উপন্যাসটিতে কমলার মতো কিছু চরিত্র আছে, যারা সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষদের নতুন করে নতুন কিছু ভাবনার মধ্য দিয়ে বাঁচতে শেখায়। উপন্যাসটি সত্তর দশকের নকশাল আন্দোলনের রাজনৈতিক পরিবেশকে লেখক চিত্রিত করার চেষ্টা করেছেন বিকাশ ও সুকুমার চরিত্রদুটির মধ্য দিয়ে। বিকাশ এক সময় নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তার মূল্য তাকে চোকাতে হয়েছে সারা জীবন ধরে। তার শরীরের এখানে ওখানে কয়েকটা রাজ্যটীকার দাগ। 'রাজটীকা। পুলিশ চুরুটের ছ্যাকা দিয়ে বানিয়ে দিয়েছে।' [পৃ. ৪২২][১১২] এমনকি বিয়ের দিন বাসর রাতে বাসরঘর থেকে বিকাশকে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ। তার বিবরণ কমলা দিয়েছে—

..... ও হ্যাঁ, পুলিশ। কমলা বলল, কতজন তা বলতে পারব না। বাসরঘর ঘিরে ফেলেছিল। পুরো বাড়িটাই নাকি ঘিরে ফেলেছিল ওরা। গ্রামেরও নানা জায়গায় মোতায়েন ছিল পুলিশ। সে গল্প তো আজও গ্রামের লোকেরা করে। [পৃ. ৪২৩][১১৩]

বিকাশের স্মৃতি জুড়ে শুধু নকশাল আন্দোলনের ঘোর আর করো বছরের বীভৎস জেল জীবনের অভিজ্ঞতা। চারু মজুমদারের প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে সে বলে উঠেছে—

আমি কখনও চারু মজুমদারকে চোখে দেখিনি। কখনও কোনও অ্যাকশান স্কোয়াডে আমাকে কেউ নিয়ে যায়নি। তবে হ্যাঁ, আমি গণবিপ্লবে বিশ্বাস করতাম কমলা। এখনও করি। এসব অত্যাচার, শোষণ, জাল-জুয়াচুরি, ভণ্ডামি, এসবের অবসান হবে, এমন একটা পৃথিবী সৃষ্টি হবে কমলা, যেখানে মানুষ মানুষে বন্ধু হবে, মানুষকে মানুষ ভালোবাসবে, মর্যাদা দেবে, কোনও অবিচারের শিকার কেউ থাকবে না, এ সবে আমি বিশ্বাস করতাম কমলা, আজও হ্যাঁ, আজও করি। এই বিশ্বাসটাই আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল ওরা। পারেনি। [পৃ. ৪২৫][১১৪]

নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নেতাদের উপর পুলিশি অত্যাচারের বিবরণ দিয়েছেন বিকাশ—পুলিশ তার কাছ থেকে অন্যান্য নকশাল আন্দোলনকারী নেতাদের নাম জানতে চেয়েছিল কিন্তু বিকাশ পুলিশের কাছে কিছুতেই মুখ খোলেনি। তার বদলে সে নিজে পুলিশের অত্যাচার সহ্য করেছে।

আমি আমার হাত দিয়েছি, আমার হাতের আঙুলগুলো ওরা একটা একটা করে ভেঙেছে। আমার পা দিয়েছি, পায়ের আঙুলগুলো ওরা একটা একটা করে ছেঁচে দিয়েছে মুগুর দিয়ে, আমি আমার গোটা শরীরটাই ওদের হাতে তুলে দিয়েছিলাম, আমার শরীরের চামড়া চুরুটের ছ্যাঁকা দিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে একটু একটু করে। কিন্তু আমি আমার বন্ধুদের নাম ওদের কাছে তুলে দিইনি। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৪২][১১৫]

তৎকালীন সরকার এবং তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জমির মালিক ও জোতদার শ্রেণি, তারা পুলিশি অত্যাচারের মাধ্যমে নকশাল আন্দোলনকে দমন করতে চেয়েছিল। কিন্তু সর্বত্র তা সম্ভব হয়নি। আন্দোলন ধীরে ধীরে বিরাট আকার ধারণ করতে থাকে। বিকাশ বলে—

(ক) জানো কমলা, আমরাও এক সময় বাংলা বন্ধ নিয়ে মেতে উঠতাম। আমার এক বন্ধু, সে আমাদের নেতাও ছিল, সেই ছিল আমাদের পান্ডা। ব্যারিকেড তৈরি করে, ট্রাম বাস থামিয়ে দিতে সে ছিল ওস্তাদ ওই সময় তার যেন চেহারাই পাল্টে যেত। খেপে উঠত একেবারে। বলত, টিলাটা দখল নেবার সময় এসেছে কমরেড। এবার তৈরি হও। .....

বাংলা বন্ধ। মিছিল। বাংলা বন্ধ। পোস্টার। পোস্টার। পোস্টার। বাংলা বন্ধ। শ্লোগানের গর্জন। দাউ দাউ আগুন বাসে আগুন। বোমা, গুলি গ্যাস। [সমগ্রন্থ, পৃ.৪৫০] [১১৬]

(খ) আমরা একসময় সন্ত্রাসে বিশ্বাস করতাম। বিশ্বাস করতাম, খুন করো, গোটা কতক লোককে খুন করো, বিপ্লবের পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে। প্রশস্ত হবে। অত্যাচারিত নিপীড়িত যারা, যারা সব দিক থেকে বঞ্চিত, তারা এসে আমাদের দল ভারী করবে। আমার বন্ধুরা খুনে মেতে গেল। তাদের সঙ্গে আমার যোগ ছিল, শুধু এই কারণে আমাকেই ধরে নিয়ে গেল। পঙ্গু হয়ে গেলাম কমলা। কিন্তু যে লোকটা আমাকে পঙ্গু করে দিল। আরও অনেকেই এরকম করেছে, খুন কিন্তু সে হল না। সে প্রমোশন পেল। বড় অফিসার হল। আরও বড় হবে। খুন হল কারা জানো? আমরা খতম করলাম, ঐ যে যে-দুটো লোক আমাকে যত্ন করে ট্রেনে তুলে দিয়ে গেল, ওদেরই মতো কিছু লোক। আমরা তো ভেবেছিলাম, আমাদের পিছনে বঞ্চিত ক্ষুধার্ত মানুষের ভিড় বাড়বে। কিন্তু তারা সব একে একে সরে পড়ল। [তদেব, পৃ. ৪৭১][১১৭]

নকশাল আন্দোলন করার জন্য বিকাশকে বারো বছর সরকারের জেল হেফাজতে থাকতে হয়েছে। অন্যদিকে উপন্যাসটিতে দেখা যায় নকশাল আন্দোলনকারী সুকুমারকে মরতে হয়েছে পুলিশের গুলিতে। যার মাথার দাম সরকার

ধার্য করেছিল দশ হাজার টাকা। অর্থাৎ সুকুমারদের মতো মানুষের জীবনে এই রকম মৃত্যুই স্বাভাবিক মৃত্যু। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জীবনকে লেখক খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। যার দরুন লেখকের কলম থেকে বেড়িয়ে এসেছে বিকাশ ও সুকুমারের মতো দুটি বাস্তব চরিত্রের চরিত্রঙ্কন।

লেখকের উপন্যাসগুলিতে যেমন স্বাধীনতা পূর্ব, স্বাধীনতা সমসাময়িক এবং পরবর্তী সময়ের রাজনৈতিক নানা জটিলতা, এমনকি ভাঙা-গড়ার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। ঠিক একই রকমভাবে তাঁর গল্প রচনার ক্ষেত্রেও ঐ এক কথা বলা যেতে পারে। বরং গল্প রচনার ক্ষেত্রে বাস্তবতার পরিমাপ আরো বেশি বলা যেতে পারে।

বিশ শতকের চল্লিশ-পঞ্চাশের দশক থেকে গৌরকিশোর ঘোষ গল্প রচনা করতে শুরু করেন। যুদ্ধ-মন্বন্তর-সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেশবিভাগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-দেশকাল চিহ্নিত কিছু নরনারী আর গল্পকারের জীবনজিজ্ঞাসা থেকে উঠে এসেছে গল্পের বিষয়। আমরা গল্পগুলোকে নিয়ে আলোচনা করার আগে দেখে নিতে হবে তাঁর গল্প গ্রন্থের তালিকাটি।

গল্পগ্রন্থের নাম	প্রকাশ কাল	প্রকাশক
১। এই কলকাতা	প্রথম সংস্করণ ১৯৫২ [প্রথম সংস্করণ পাওয়া যায় না] (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ ৭ই জ্যোষ্ঠ-নতুন সংস্করণ) উক্ত গল্পগ্রন্থটি রবিবারের 'সত্যযুগে' ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল ১৯৪৮-৪৯ সালে। এরপর তা বই আকারে প্রকাশিত হয়।	ভারতী গ্রন্থ ভবন।
২। মন মানে না	প্রথম সংস্করণ (১৩৬৬ বঙ্গাব্দ) উক্ত গল্পগ্রন্থের 'মন মানে না', 'শিশির' এবং 'একটি প্রতিশোধের কাহিনী' দ্বন্দ্ব পত্রিকায়;'আগামী'- উত্তরসূরীতে; 'ম্যানেজার' শারদীয় জনসেবকে; আর 'জবানবন্দী' 'অন্ধকূপ' দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।	ত্রিবেণী প্রকাশন।
৩। সাগিনা মাহাতো	প্রথম সংস্করণ (মার্চ, ১৯৬৯) ১৯৫৮ সালে বর্তিকা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত 'চেনামুখ' গল্প সংগ্রহের পাঁচটি গল্প এবং ১৯৫৪ সালে বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত 'কথায় কথায়' (রুপদর্শী) গল্প সংগ্রহের 'কমরেড নির্মলা সেন' গল্পটি নিয়ে 'সাগিনা মাহাতো' প্রথম প্রকাশিত হয়।	আনন্দ পাবলিশার্স
৪। আমরা যেখানে	প্রথম সংস্করণ (জুন,১৯৭০) গ্রন্থারম্ভে লেখকের বক্তব্য—''এ কাহিনীর নায়িকাঙ্ম কলকাতা—যে কলকাতা এখন প্রচণ্ড হিংস্রতা আর অন্ধ আতঙ্ক, এ দুটি প্রবৃত্তিই প্রবল। আর নায়কঙ্ম সময় ১৯৬৯-৭০। বাকি সবাই পার্শ্বচরিত্র।''	আনন্দ পাবলির্শাস
৫। পশ্চিমবঙ্গ এক প্রমোদ তরণী, হা হা—	প্রথম সংস্করণ (১৩৭৯ বঙ্গাব্দ) এই গ্রন্থের কাহিনিগুলির পটভূমি কলকাতা, রচনাকাল—১৯৬৫-১৯৭০ এছাড়া লেখকের অগ্রন্থিত গল্পের সংখ্যা প্রায় দশ থেকে বারোটা। গল্পগুলি বিশ শতকের ষাটের দশক থেকে নব্বইয়ের দশকের মধ্যে লেখা।	দে'জ পাবলির্শাস

এবার আমরা তাঁর গল্পগুলির আলোচনায় প্রবেশ করার পর দেখতে পাই যে, লেখকের বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতাই গল্পের মূল আলোচ্য বিষয়। যেমন 'এই কলকাতা' গল্পটিতে ১৯৪৮-৪৯ সালের কলকাতার রেখাচিত্র দেখতে পাই। গল্পটি অনেক সমালোচক আত্মজৈবনিক আখ্যা দিয়েছেন। কলকাতার তৎকালীন রেখাচিত্রের পাশাপাশি, রাজনৈতিক নানা টানাপোড়েনের চিত্রও দেখতে পাওয়া যায়। গল্পটিতে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির প্রসঙ্গ না থাকলেও, কলকাতার রেখাচিত্রের মধ্যেই রয়েছে রাজনৈতিক নানা অভিসন্ধির চিত্র। লেখক তাঁর প্রথম জীবনের বেশ কিছু বছর নবদ্বীপে কাটানোর পর জীবিকার তাড়নায় কলকাতায় এসেছিলেন কিন্তু কলকাতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে লেখকের অভিজ্ঞতা হয়েছিল মারাত্মক।

> এই কলকাতায় আবার পা দিলুম।
>
> ন'টা সাতান্নর লোকাল থেকে বোরা-ছেঁড়া আলুর মতোই একদিন সবার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়লুম গোটা প্লাটফর্মে। [এই কলকাতা, পৃ. ৩][১১৮]

কলকাতায় পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে লেখকের মনে হয়েছে 'সর্ববিষয়ে লায়েক হতে আর অল্পই বাকি'। লেখক হয়তো মনে মনে ভেবেছেন—

> সময়টা আবার এমন, শক্ত করে হাল ধরতে না পারলে ঘূর্ণির চক্করে বিনি পয়সায় ঘোল খেয়ে নিতে হয়। যুদ্ধের শুরুর কথাই বলছি। তামাম দুনিয়ার মানুষ যেন আর মানুষ নেই। কোনও এক রূপকথার দৈত্যের ফুসমন্তরে দুটো লড়ুয়ে মুরগি বনে ও একে ঠোকরাতে শুরু করেছে, দূর বিদেশের লোক, কোনওদিন চর্মচাক্ষুস না করলেও আমাদের চেনা দরিয়ার কূলে কূলে বা'চ খেলে বেড়াচ্ছে। চেম্বারলেন, চার্চিল, রুজভেল্ট, স্ট্যালিন, হিটলার, মুসোলিনি, তোজো অপরিচয়ে চেগারের বাইরে দাঁড়িয়ে আর গলা খাঁকারি দেয় না। সকল আগল ঠেলে অপরিচয়ের অন্দরমহলে হুট করে প্রবেশ করে মামি পিসির দেওর ভাশুরের মতোই। [পৃ. ২০][১১৯]

যুদ্ধ শুরুর সময় কলকাতার এক রূপ, যুদ্ধ শেষের পর কলকাতার আরেক রূপ। তখন কলকাতার চারিদিক শান্ত, স্তব্ধ, যেন মনে হয় নতুন কোনো এক ঝড়ের পূর্বাভাষ।

> গ্রাম মফস্বল যখন আমদানি করা প্রাণ প্রাচুর্যে ক'দিনের মতো উজ্জ্বল উচ্ছল তখন কলকাতা? কলকাতা যেন একাদশী। বেশ মোটা সোটা ষড়ৈশ্বর্যময়ী রূপসী গিন্নির যেন সদ্য পতিবিয়োগ হয়েছে। কান্না থেমে এখন থমথমে ভাব। অনভ্যস্ত উপোস তার শুকনো ফরসা মুখখানার মতোই লাগছে কলকাতাকে রাতের কলকাতা নিবু নিবু। রাস্তার বাতিগুলোর সে ফাজিল চোখের ড্যাবা ড্যাবা চাউনি নিশ্চিহ্ন। একটু বেচাল বেসামাল হতে যাচ্ছিল বোধহয়। গুরুজনের ধমক খেয়ে এখন ঘেরাটোপের আড়ালে মুখ লুকিয়ে লজ্জা ঢাকছে। আর কলকাতার বাড়তি পতিত বাসিন্দেরা দিন কাটাচ্ছে আকাশচক্ষু হয়ে। অর্থাৎ এক চোখ সদা সর্বদা আকাশে নিশান করে বাকিটা দিয়ে কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকী সরকারি দপ্তরখানার অথর্ব চোখ দুটোও ঘুম ভেঙে, তুড়ি মেরে, হাই তুলে, আড়মোড়া ছেড়ে, পিঁচুটি মুছতে লেগে গেছে। হাওয়াই হামলার হাত থেকে বাঁচবার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। খোলা হয়েছে এ. আর. পি. দপ্তর। চলতি কথায় যাকে আমরা ''এবার রক্ষাপাত্ত'' বলতাম। [পৃ. ২১][১২০]

সেই সময় কলকাতার রাস্তার খেতে না পাওয়া কঙ্কাল সার মানুষের ঢল নেমেছিল। তাদের জন্য খোলা হয়েছিল নানা ধরনের ত্রাণ শিবির বা রিলিফ ক্যাম্প। সেই ক্যাম্প চালানোর জন্য যুবকদের সেখানে রিক্রুট করা হত। অন্য দিকে আন্তর্জাতিক স্তরে চলেছে যুদ্ধের প্রস্তুতি।

> তখন সিঙ্গাপুরে বোমা পড়ছে। রেঙ্গুন ছাতু ছাতু। বর্মার জাপানিরা ঢুকে পড়েছে। ওসব অঞ্চলে দারুণ লড়াই হচ্ছে শুনতে পাচ্ছি। লড়াই সম্বন্ধে ব্যারাকে বসে নানারকম আলাপ আলোচনা হয়, শুনি। একদিন শুনলুম, এই এ. আর. পি. এ আর কিছু নয়, লড়াই-এ ভর্তি করবার আড়াকাঠি। এখানে যারা ভর্তি হয়েছে কারো আর নিস্তার নেই। সবাইকে যুদ্ধে যেতে হবে। গুজবটা এমনভাব ছড়াল যে আমাদের ক্যাম্প থেকে একরাত্রেই

প্রায় ত্রিশজন পলিয়ে চলে গেল। ওদের পালাতে দেখে সকলের মনেই ভয় ঢুকল। একরাত্রে ঘুমুচ্ছি, ঢং ঢং ঘন্টা শুনে চমকে উঠে পড়লুম, স্বপ্ন দেখছিলুম জাপানিরা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে নরমুণ্ডের বোমা ফেলছে। [তদেব, পৃ. ৪৩][১২১]

লেখকের মতো অনেকেরই যুদ্ধের বীভৎসতার সঙ্গে পরিচয় হল খুব কাছ থেকে। রেঙ্গুনে যুদ্ধের ফল ভোগ করতে হয়েছিল বাংলার মানুষকে। দু'জাহাজ ভর্তি আহতদের পাঠিয়ে দিয়েছিল রেঙ্গুন সরকার। লেখক সেই পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়েছেন 'এই কলকাতা' গল্পাংশটিতে—

দুটো জাহাজ ভর্তি আহতের ভিড়। বৃদ্ধ যুবক শিশু পুরুষ নারী। কেউই রেহাই পায়নি। কারো হাত নেই, কারও পা নেই, মাতা ফাটা, চোখ খুব নানো। বিকলাঙ্গ মানুষের ভিড় এমনভাবে আর নিবিড় করে দেখিনি। অনভ্যস্ত স্নায়ু ঠিক থাকতে পারল না। পুঁজ রক্তের পচা গন্ধে গা ঘুলিয়ে উঠল। [পৃ. ৪৪][১২২]

যুদ্ধ শুরু হয়েছিল রেঙ্গুনে, কিন্তু ভারত তথা বাংলা থেকেই সেই যুদ্ধের সেনাবাহিনী পাঠানো হয়েছিল। যুদ্ধের আঁচ শুধুমাত্র শহর কলকাতাতেই নয়, শহরতলি ও গ্রামেও তার প্রভাব পড়েছিল। তখন কলকাতা এক স্বজনহীন দুঃখিনী কলকাতায় পর্যবসিত হয়েছিল। তাই কলকাতার বাইরে থেকে অর্থাৎ শহরের প্রান্ত থেকে যারাই গেছে তাদেরকে দুই বাহু প্রসারিত করে আপন করার চেষ্টা করেছে।

ভাঙা একটা টিনের সুটকেস সম্বল করে একদিন কলকাতায় এসেছিলুম। আর এই কলকাতা ছাড়লুম এক ভাঙা মনের তোরঙ্গ ঘাড়ে করে। হাওড়ার নতুন পুলের অর্ধেকটা তখন তৈরি হয়েছে। পুরনো পুলটার ওপর দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে গেলুম। নতুন পুলের অর্ধসমাপ্ত গার্টার গুলো গঙ্গার উপর ঝুলে রয়েছে। আমার মনে হল ওগুলো অভ্যর্থনা—আকুল কলকাতার প্রসারিত দু'টি বাহু! সস্নেহ দু'টি বিশাল বাহু বাড়িয়ে স্মিত হেসে কলকাতা যেন বলছে, আগচ্ছ, ইহ আগচ্ছ। এস ফিরে এস। এসেছি, বার বার এসেছি এই কলকাতায়। আনন্দ পেয়েছি, আঘাত পেয়েছি। বিপর্যস্ত পর্যুদস্ত হয়ে ফিরে ফিরে গেছি। তবু কলকাতার ডাক এড়াতে পারিনি। কিন্তু থাক! সে তো নতুন কেচ্ছা। [তদেব, পৃ.৬০][১২৩]

লেখকের বাস্তব জীবনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় 'শিকার' ও 'ম্যানেজার' গল্পে আমাদের সকলেরই জানা যে, দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এসেছিল। সেই সঙ্গে বিশ্বরাষ্ট্র পুঞ্জ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তাতে শান্তি স্থাপিত হয়নি। নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় ও ভয়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে দলে দলে মানুষ পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে আসতে থাকে। আর সেই সমস্ত মানুষেরাই 'শিকার' গল্পাংশে ভিড় করেছে। গল্পটিতে একদিকে দেখা যায় ঘরের মেয়ে-বউয়ের মান-সম্মান বাঁচাতে নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে, সহায় সম্বলহীন ভাবে পূর্ব পাকিস্তান থেকে নিরুদ্দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে অনেকেই প্রাণের ভয়ে। তার বিবরণ লেখক দিয়েছেন—

পালাল হুড়হুড় করে, পাকিস্তানে শুধু নাকি মুসলমানরাই থাকবে। হিন্দুদের নাকি স্থান নেই সেখানে, মাতব্বরদের কাছেও ছুটেছিল তারা। মেদ্ধা সাহেব, গাজি সাহেবরা তো ভরসা দিলেন। ভিটে ছেড়ে যেতে বারণ করলেন। গুজব কথায় কান দিতে নিষেধ করলেন। পাকিস্তান কি, হিন্দুস্থান কি, এই গাঁয়ের মাটি তাদের। সেই ভরসাতেই তো ছিল এতদিন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে সবাই পালাল বাড়ি-ঘর খালি করে। খালি বাড়ি-ঘর পেয়ে ঢুকতে লাগল বিদেশি বিজাতিরা। ....কিন্তু গাঁয়ের সবাই যখন পালাল, সব কটা গাঁ যখন প্রায় খালি হয়ে এল, যখন কেউ রইল না, টেপাখোলায় হরিনারায়ণপুরে, সহদে'য়, মোষবাতানে ... গাঙদিঘড়েয়, তখন ওরাই বা একঘরে কি করে থাকে টিম টিম করে। ওদেরও তো মান সম্ভ্রম আছে। আছে মাগ মেয়ে। [তদেব, পৃ. ৮৩][১২৪]

তখন তারা সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। এখানে এসেও তারা নানা সমস্যার সন্মুখীন হয়। তখন তাদেরকে বলতে শোনা যায়—''পাকিস্তান থেকে আসছি। আমরা হিন্দু। অসহায় বাস্তুহারা সম্বল শূন্য প্রায়। কিছু জানি নে।" [তদেব, পৃ. ৮৭][১২৫] বাস্তুত্যাগী মানুষগুলি আশ্রয়ের সন্ধানে 'বাস্তু-হারা-ত্রাণ সমিতির সম্পাদক'কে

আঁকড়ে ধরে জমা পুঁজি নিঃশেষ হয়ে যায়। পরিবারের ছোটো বউ হারিয়ে যায়, বড়ো ভাই কুঁড়োরাম অকালে মারা যায়। পাকিস্তান থেকে আসার সময় এরা ছিল 'নোয়জন লোক আর সাতটা মো-ও-ট।' এখন ফেরার সময় তারা 'সাত জন লোক আর একটো মো-ও-ট।' [তদেব, পৃ. ৯১][১২৬]

'ম্যানেজার' গল্পের পটভূমি দাঙ্গা-বিধ্বস্ত-মন্বন্তরের বাংলার নবদ্বীপ। গল্পটিতে ম্যানেজারের মতো ভিক্ষোপজী কী তথা মাধুকরী বৃত্তির মানুষকে বলতে শোনা যায়—''কী আকাল যে দেশে এল, কী আকাল! চাল নেই, ধান নেই। ভিক্ষে বন্ধ হল। মাধুকরী মেলে না।" [তদেব, ১২৬][১২৭] গল্পটিতে দেখানো হয়েছে—মন্বন্তরের সময়ে মধ্যবিত্ত পরিবারেও অনটন দেখা দেয়। বস্ত্রাভাব, দিনের বেলা মেয়েরা বাইরে বেরোতে পারে না, এমনকি লঙ্গরখানায় খিচুড়ির লাইন দিতে পারে না। তাই গল্প কথককে বলতে শোনা যায়—

> এই তো আমার চোখের সামনেই কত জন মারা গেল। গ্রাম থেকে ধুঁকতে ধুঁকতে শহরে এসেছিল, ছটফট করে মরল ক্ষিধের জ্বালায়। আমাদের সঙ্গে পড়ত হরে কেষ্ট বৈরাগী। আর জ্যাঠা গলায় দড়ি দিলেন। বিপিন স্যাকরার বউ বেরিয়ে গিয়ে বেশ্যা হয়ে গেল। সারা শহর ভরে উঠল মানুষের তীব্র ক্ষিধের দূষিত গন্ধে। [পৃ. ১২৭][১২৮]

'ম্যানেজার' গল্পের পটভূমি যুদ্ধ-মন্বন্তর-দেশবিভাগের সময়ের নবদ্বীপ। নবদ্বীপে ম্যানেজারের মতো ভিক্ষেপজীবী তথা মাধুকরীবৃত্তির মানুষের সংখ্যাও সেই সময়কম ছিল না। মন্বন্তরের সময় মধ্যবিত্ত পরিবারেও অনটন দেখা দিয়েছিল। বস্ত্রাভাব, দিনের বেলা মেয়েরা বাইরে বেরোতে পারে না, লঙ্গরখানায় খিচুড়ির লাইন দিতে পারে না—এই সমস্ত প্রত্যেকটি ঘটনার সাক্ষী-লেখক গৌরকিশোর ঘোষ। কারণ তখন তিনি কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র শাখার কর্মী হিসেবে ফুড কমিটি বা রিলিফ কমিটিতে কাজ করেছেন এমনকি লঙ্গরখানাও চালিয়েছেন।

'ম্যানেজার' গল্পটিতে আমরা দেখতে পাই মাখনসার মতো তথাকথিত ব্যবসায়ীরা ব্ল্যাকমার্কেটের দৌলতে ফুলে ফেঁপে রাজা হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে তারা যাবতীয় মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়েছে। যখন মানুষ অন্নাভাবে মরছে, বস্ত্রাভাবে লজ্জা নিবারণ করতে পারছে না, তখন মাখন সা-র লুকোনো গুদামে হাজার হাজার মন চাল, শত শত গাঁট কাপড় পড়ে রয়েছে। মাখন-সার মতো মানুষেরা মেয়েদের দেহ বিক্রয়ের মতো জঘন্য কাজের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছে। গল্পটিতে, মাখন সা ও লঙ্গরখানার যে চিত্র আমরা দেখতে পাই তা অতিবাস্তব। কারণ লেখক আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত নবদ্বীপে কাটিয়েছেন অর্থাৎ যুদ্ধ শুরুর সময় পর্যন্ত। আমরা আগেই বলেছি যে, লেখক ফুড কমিটি বা লঙ্গরখানার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ফলে বাস্তব অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন লক্ষ করা যায় নিম্নোক্ত চিত্রটিতে—

> ফুড কমিটির তরফ থেকে লঙ্গরখানা খোলা হল। ক'দিন তাই নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। বেলা বারোটা থেকে সন্ধে ছটা—এই ছয় ঘন্টা আর বিরাম পাওয়া যেত না, আমরা চালে-ডালে সাত মণ সিদ্ধ করতাম রোজ। ফুস করে উড়ে যেত। থাকত শুধু খাই খাই রব। পেট যে মানুষের কী তখন টের পেয়েছি। পেটে সইছে না, প্রায় কলেরার মতো হয়েছে লোকের, লঙ্গরখানা নষ্ট করে দিচ্ছে, তবুও গবগব করে গেলার কামাই নেই। [তদেব, পৃ. ১২৮][১২৯]

তখন লঙ্গরখানার নিয়ম ছিল একজন দিনে একবার খাবে। প্রত্যেকের মাথাপিছু বরাদ্দ ছিল মচ্ছবের হাতার তিন হাতা খিচুড়ি। কিন্তু অনেকে দিনে দুবার তিনবার করে খেয়ে যায়। অন্যদিকে আবার কেউ কেউ একবারও পায় না। 'ভাল কথায় অনেক বোঝাবার চেষ্টা করা হল, কিন্তু ক্ষিধে কি বুঝ মানে?' [তদেব, পৃ. ১২৮][১৩০] চারিদিকে খালি ক্ষুধার্ত মানুষের দল, তারা যেখানে যখন খাবার পেয়েছে মাটির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে তাই চাটতে লাগল। এরই মধ্যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে গেছে। বন্যায় মানুষের সাজানো সংসার ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

> রানিরচড়া, রামচন্দ্রপুরে কত পয়সাওয়ালা লোক, মহাজন, যারা বাসা বেঁধেছিল, এই বন্যায় তাদের অনেকে স্বর্বসান্ত হয়ে গেছে। ওপারে চর ব্রহ্মনগরে পাকিস্তান থেকে আসা পাঁচ হাজার ঘা খাওয়া তাঁতি পরিবার তাদের ভাঙা সংসার গুছিয়ে তুলেছিল। .... বন্যার এক ধাক্কায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল তাদের সাজানো সংসার। [তদেব, পৃ. ১৩৩][১৩১]

চারিদিকে বাতাসে বারুদের গন্ধ, আর দেশজোড়া আকাল। সরকারের হিসেব অনুযায়ী সারা দেশে উপোসী মানুষের সংখ্যা ছিল তিন কোটি। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে সারা দেশ জুড়ে খাদ্যের জন্য আকাল ও খাদ্য সমস্যা লেগেই ছিল। বাংলার পল্লী অঞ্চলে খাদ্য সঙ্কট চরমে পৌঁছেছিল। সে চিত্র আমরা 'ম্যানেজার' গল্পটিতে দেখেছি। স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য সমস্যা লেগেই ছিল। ফসল ভালো হলেও তার ব্যতিক্রম হত না। খাদ্য সংগ্রহ, বন্টন ব্যবস্থা ও তার দর বেঁধে দেওয়া এর কোনোটাই রাজ্য সরকার কোনো দিনই সার্থকভাবে কার্যকর করতে পারেনি। এই বিষয়ে অমলেন্দু সেনগুপ্ত বলেছেন—

> জোতদার মহাজন ও ধনীচাষীরা তাড়াতাড়ি ধান কেটে ট্রাক ও গরুর গাড়ি বোঝাই ধান বিহার আর পূর্ব পাকিস্তানে পাচার করতে থাকে। [জোয়ার ভাটার ষাট-সত্তর, পৃ. ৬২][১৩২]

ধীরে ধীরে পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যের চোরাকারবারিদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়। সেই সঙ্গে পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক জীবনেও পালাবদল ঘটে। তৎকালীন সময়ে পশ্চিমবাংলার রেশন ব্যবস্থাতে অচলাবস্থা দেখা গিয়েছিল। সেখানেও ঠিক মতো রেশন পাওয়া যাচ্ছিল না। বিভিন্ন অঞ্চলের রেশন দোকানদারদের অভিযোগ উঠতে থাকে—

> খাদ্য দপ্তর হপ্তায় তিন দিনের চাল গম পাঠায় না। যা পাওয়া যায় তাও অনিয়মিত। তার জন্য কালোবাজারিরা সুযোগ পাচ্ছে। [জোয়ার-ভাটার ষাট-সত্তর, পৃ. ৬২][১৩৩]

খাদ্যাভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন পল্লী-অঞ্চলের সাধারণ মানুষদের বস্ত্রাভাব। সেই সঙ্গে দেশভাগের পর পাকিস্তান থেকে এক বস্ত্রে চলে আসা মানুষেরাও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে আশ্রয় নিতে থাকে। তাদের মধ্যে বেশি আশ্রয় নিয়েছিল,পশ্চিমবঙ্গেই। এর ফলে বস্ত্র সঙ্কটের অভাবও তীব্র ভাবেই দেখা দিয়েছিল। একমুঠো ভাত ও বস্ত্রের প্রয়োজনে সাধারণ ঘরের মেয়ে-বউরাও রাস্তায় নেমেছিল জীবিকার প্রয়োজনে। তৎকালীন সময়ের কঠিন বাস্তবতার সঙ্গে পাঠককে মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিলেন গৌরকিশোর ঘোষের সমসাময়িক আরেকজন লেখক সন্তোষকুমার ঘোষ। সন্তোষ কুমার ঘোষের 'কিনু গোয়ালার গলি', 'নানা রঙের দিন' ও 'সুধার শহর' উপন্যাসে সুধা, সরমা ও নীলার মধ্যে চরিত্রের বলিষ্ঠতা প্রকাশ পেয়েছে। যার সূত্রপাত লক্ষ করা যায় গৌরকিশোর ঘোষের গল্পের চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে। যেমন—তাঁর 'জবানবন্দি' গল্পে তার পূর্বাভাষ দেখতে পাওয়া যায়।

বিশ শতকের পঞ্চাশ ষাট দশকে পশ্চিমবাংলার নারীর অবস্থা হয়েছিল অনেকটা পুরাণের দ্রৌপদীর মতো। তবে বিশ শতকের দ্রৌপদীর জীবনে ব্যক্তিগত কোনো ঘটনা আর গোপন থাকবে না, সবই বের করে আনা হবে সকলের সামনে সমাজের সম্মুখে। যেমন—'জবানবন্দি' গল্পে 'মেনকা'র ক্ষেত্রে ঘটেছিল। 'তার এখন দ্রৌপদীর অবস্থা। তার যা কিছু গোপন এরা তা এবার টেনে বের করবে। তারই উদ্যোগ সে চারদিকে দেখতে পাচ্ছে। তার লাজলজ্জা মানসম্ভ্রম হরণে সবাই যেন উদগ্রীব।' [পৃ. ১৩৫][১৩৪]

মেনকা পাকিস্তান থেকে নিরাশ্রয় হয়ে এদেশে এসেছিল। নানা আশ্রয়-শিবির ঘুরে পাটনায় উপস্থিত হয়েছিল। একটি নিরাপদ আশ্রয়ের আশায়। মেনকা বড় নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছিল। পরনে ছিল শতচ্ছিন্ন একটা কাপড়। পিছনে অতীত তার শূন্য। অধিকাংশ উদ্বাস্তু মেয়ের মতো। এমনকি চরম লাঞ্ছনার স্মৃতিগুলোও সেই শূন্যতায় বিলীন হয়ে গেছে। বর্তমানও তার কাছে এক আকারবিহীন অস্তিত্ব মাত্র। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই। ভবেশবাবুর আশ্রয়ে আসার আগে মেনকা তার নিজের অবস্থান সম্পর্কে বর্ণনা করেছে—

> মানুষ বলতে যদি হাড় মাংস দিয়ে গড়া একটা জীবিত অবয়ব বোঝায়, তবে তখনও আমি মানুষ ছিলাম। কিন্তু ওই অবয়বটুকুই। তার বেশি আর আমার তখন কিছু ছিল না।
>
> ওঁর আশ্রয়ে আসবার বছর পাঁচ-ছয় আগেও আমার সব ছিল। বাড়ি, ঘর, আশা ভবিষ্যৎ-সব। কিন্তু যে রাত্রে আমাদের বাড়ি লুঠ হল, বাবা খুন হলেন, ভাইয়েরা পালালো, আমার কুমারী দেহটা বার কয়েক ধর্ষিত হল দুর্বৃত্তের হাতে, সেদিন থেকে তিলে তিলে আমার সব গেছে।

পালিয়ে এলাম ভারতে। নিরাপদ আশ্রয়ের আশা তখনও ছিল। শুনেছিলাম সীমান্ত পার হলেই নিশ্চিন্ত হতে পারব। ওদিকে আশ্রয় আছে। মানসম্ভ্রমের মূল্য আছে। সীতার দেশে, সাবিত্রীর দেশে সতীধর্ম অটুট রাখবার কাণ্ডারী আছে। তাই জীবন তুচ্ছ করে ছুটে এলাম পশ্চিমবঙ্গে। স্থান পেলাম উদ্বাস্তু শিবিরে। কিন্তু সেখানেও আমার রূপ আর যৌবন নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারিনি। নিরুপায় হয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বদলি হয়েছি। দেহ দিতে বাধ্য হয়েছি নানা জনকে।

দেহটার জন্য আর ভাবনার কিছু ছিল না। অভিজ্ঞতায় জানলাম, সে ভাবনা নামগোত্রহীন উদ্বাস্তু-মেয়েদের কাছে অনর্থক শুচিবাই ছাড়া আর কিছু নয়। তবু উদ্বাস্তু শিবির ছেড়ে পালিয়েছি। কারণ টিকতে পারিনি। মৃত আর অথর্ব ছাড়া কেউ সেখানে থাকতে পারে না। [পৃ. ১৫০][১৩৫]

লেখকের রাজনৈতিক চেতনার তীব্র প্রতিফলন লক্ষ করা যায় 'সাগিনা মাহাতো' গল্পটিতে। লেখক 'সাগিনা মাহাতো' গল্পটি লেখেন ১৯৫৮ সালে। গল্পটি প্রথমে 'চেনামুখ' গল্প সংকলনে স্থান পেয়েছিল। পরে গ্রন্থের নামটি পরিবর্তন করা হয়। গৌরকিশোর ঘোষের রাজনৈতিক জীবনে যে চরিত্রগুলির সঙ্গে চেনাজানা হয়েছে, তাঁদের নিয়েই গড়ে উঠেছে 'চেনামুখ' গল্প সংকলনের (সাগিনা মাহাতো) গল্পগুলি। 'সাগিনা মাহাতো' গল্প সংকলনের গল্পগুলির চরিত্রগুলির সঙ্গে একদা বিপ্লবী দল থেকে কমিউনিস্ট দলে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে 'বাসন্দা' যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন 'দেব্দা'। তৎকালীন পার্টির কূট-রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে বেশিদিন খাপ খাইয়ে নেওয়া বসন্দা পক্ষে সম্ভব ছিল না।

বাসন্দার কাছে বিপ্লব মানে গায়ের জোরের প্রদর্শনী। হাল রাজনীতিতে তার স্থান কোথায়? প্রকাশ্য রাজনীতিতে বিপ্লবের অর্থ অন্য। গণ-আন্দোলন চাই। হাতের জোরের স্থান নেই, এখানে শুধু মুখের জোর, গরম গরম বক্তৃতায় লোককে চাগিয়ে তুলতে হবে। এই পার্টিতে বাসন্দার জায়গা কই? যে বসন্দা হাতে ধরে ধরে এক-একজনকে রিক্রুট করেছেন, আজ তারাই প্রধান, বাসন্দা এক পাশে। আজকের পার্টিতে বাসন্দার মূল্য ছেঁড়া মাদুরের মতো। [পৃ. ১৮৩][১৩৬]

'কমরেড নির্মলা সেন' গল্পটিতে কমরেড হৃষীকেশ বসুর অধঃপতনের চিত্র সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। হৃষীকেশের মতো রাজনৈতিক নেতারা হলেন এক সময় পার্টির কর্মীদের কাছে আদর্শ চরিত্র। যাঁদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে পার্টিতে যোগ দিয়েছিল অসংখ্য যুব ছাত্র সম্প্রদায়। তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল 'কমরেড নির্মলা সেন'। পরে নির্মলা সেনের সর্বনাশ করায় তাঁকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়। এই ধরনের ঘটনা পার্টি পলিটিক্সে হামেশাই হয়ে থাকে। তাই গৌরকিশোর ঘোষের মনে হয়েছে—

'কেন, পার্টি পলিটিক্সের মধ্যে কি এমন রহস্য আছে, যা মানুষকে মানুষ রাখে না, আজ্ঞাবহ পুতুল করে তোলে? [পৃ. ১৩৫][১৩৭] অর্থাৎ পার্টি করা মানেই দ্বৈত ব্যক্তিত্বের পরিচর্যা। তাই শরৎদার মতো মানুষেরও মনে হয়েছে—'তোমরা তো রাজনীতি কর, তোমাদের হাত বড় নোংরা থাকে।' [পৃ. ১৩৫][১৩৮] গৌরকিশোর ঘোষ যে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের শিষ্য তা লেখকের একটি মন্তব্যে স্পষ্ট—

মানুষের মধ্যে যে অফুরন্ত সম্ভাবনা আছে তার পরিপূর্ণ বিকাশই তো স্বাধীনতা। তার বিকাশ লাভের পথে যে সব বাধা, নানা ধরনের অন্তরায়—রাজনৈতিক অন্তরায়, অর্থনৈতিক অন্তরায়, আত্মিক অন্তরায়—তা দূর করাই তো স্বাধীনতার সংগ্রাম। বিপ্লব সেই সংগ্রামের অসংখ্য হাতিয়ারের মধ্যে একটা মাত্র। [করবীদি, গল্প সমগ্র, আনন্দ ২০০৩, পৃ.][১৩৯]

তিনি সামাজিক অসাম্যে বিরোধী, অহিংসা ও মানবতাবাদী। তাঁর কাছে বিপ্লব ও স্বাধীনতা দুটি আলাদা বিষয়। দুটিকে কখনোই এক করা যায় না। তাঁর আদর্শ শরৎ মাস্টার। তিনি মনে করতেন—''স্বাধীনতা উঁচু ডালের ফল নয়। কোনও দূর গোপন স্থানে তা অপেক্ষা করে নেই কারো জন্য। প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীন হচ্ছি একটু একটু করে, আবার স্বাধীনতা বিসর্জনও দিচ্ছি।" [ভূমিকা][১৪০]

'সাগিনা মাহাতো' সংকলনের গল্পগুলি সম্ভভত ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৬ সালের অভিজ্ঞতার ফসল। গৌরকিশোর ঘোষ শুধুমাত্র রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তিই নন, সেই সঙ্গে জীবনের একটি পর্বে প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে তিনি লালমণির হাট রেলকর্মী ইউনিয়ন পরিচালনা করেছেন। যতদূর মনে হয় 'সাগিনা মাহাতো' গল্পটি ঐ সময়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা—

> আমরা এদেশে যতই শ্রমিকের নেতৃত্ব বলে চেঁচাই না কেন, বারবার দেখেছি, নেতৃত্বটি মধ্যজীবীদেরই হাতের মুঠোয় শেষ পর্যন্ত থেকে যায়। আর জদুর ভাইরা কলে কারখানায় যেমন, মনিববাবুর হুকুম তামিল করে, তেমনি ইউনিয়নে তামিল করে কমরেডবাবুদের হুকুম।
>
> বই পড়ে কত কী শিখেছিলাম। সর্বহারাই পারে বিপ্লবকে ডেকে আনতে। কারণ সে মরিয়া, তার হারাবার কিছু নেই। শ্রেণী সংগ্রামের সেরা সৈনিক তাই মজদুর। ওদের নেতৃত্বেই একদিন সারা দুনিয়ায় পতপত উড়বে লাল ঝাণ্ডা।
>
> কিন্তু লেবার ফ্রন্টের কাজ করতে এসে দেখি নেতৃত্বের উপর একচেটিয়া অধিকার রয়েছে শুধু মধ্যবিত্তের। যে পাতি বুর্জোয়া শ্রেণীর উপর আস্থা না রাখবারই তামিল পেয়ে এসেছি পার্টি সাহিত্যে, কারণ পাতি বুর্জোয়া না কি সবচেয়ে সুবিধাবাদী, শিবির বদলাতে তারা মূহূর্তের বেশি সময় নেয় না, বিপ্লবকালে এরাই দলত্যাগ করে মালিকের পা-চাটা গোলাম বনে যায়—যাদের ঘৃণা করতে শিখেছি, এখন দেখি লেবার মুভমেন্টের তাবৎ লীডার তারাই। [পৃ. ২৩১][১৪১]

তবে এ প্রসঙ্গে সাহিত্য সমালোচক অলোক রায়-এর মন্তব্যটি গল্পটির গুরুত্বকে আরো বাড়িয়ে তোলে—

> সাগিনা মাহাতো নিজে শ্রমিক হওয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব দেওয়া তার পক্ষে সহজ হয়েছে। কিন্তু মালিকপক্ষ ও ইউনিয়নের নেতারা মিলে সাগিনাকে লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার করে দিল। এইভাবে তাকে 'খতম' করার পরিকল্পনা সফল হল। এর পরে সাগিনার পতন এবং মর্মান্তিক মৃত্যু হয়তো না দেখালেও চলত। আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের এত কঠোর সমালোচনা সমসাময়িক বাংলা কথাসাহিত্যে বোধহয় আর দেখা যায়নি। [গল্প সমগ্র, গৌরকিশোর ঘোষ, ভূমিকাংশ][১৪২]

চল্লিশ-পঞ্চাশের দশক বিভিন্ন দিক থেকে বাংলার ইতিহাস তথা পৃথিবীর ইতিহাসেও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দশক হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এই সময় সারা পৃথিবীতে গড়ে ওঠে নতুন এক শ্রমিক আন্দোলন। ভারত তথা বাংলাও এই আন্দোলন থেকে পিছিয়ে ছিল না। বাংলার সমাজ মানচিত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময় থেকে বাঙালি মধ্যবিত্ত প্রগতিশীলদের ভূমিকায় ছেদ পড়তে থাকে। তৈরি হয় এক নতুন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণি। এরা নিজেদের সুযোগ-সুবিধা আদায়ে সদা প্রস্তুত ছিল। এদের নিয়েই গড়ে ওঠে 'ট্রেড ইউনিয়ন অব দ্য প্রিভিলেজেড'। বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক অনিল আচার্য সত্তরের দশক সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে চল্লিশের দশকের তথাকথিত নতুন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণি সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেছেন—

> আমাদের ঐতিহ্যানুসারী শিক্ষা ও উৎপাদন ব্যবস্থাকে পশ্চিমি ধাঁচে ঢালাই করার নব্য সংস্কৃতি গড়ে তোলার কাজে ব্যবহৃত হলেন এঁরা। এই নব্য শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের বিকাশ কেরানিগিরিতে এবং সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন ওই মধ্যবিত্ত আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন। ঔপনিবেশিক কাঠামোতেই তার বিকাশ, অথচ আন্দোলন ও বিদ্রোহকাঙ্ক্ষায় ক্ষান্তি নেই তার। এই দলে দলে শহর নগরের দিকে ধাবমান মধ্যবিত্তরা তৈরি করে পারস্পরিক পিঠ-চাপড়ানো সমিতি। তৈরি হয় 'ট্রেড ইউনিয়ন অব দ্য প্রিভিলেজেড'। তারা কখনোই চায় না তার শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার মধ্যে কোটি কোটি অশিক্ষিত মানুষ ঢুকে পড়ে তাদের স্বর্গলোক ধ্বংস করে দিক।
>
> দেশভাগের সমস্যার চাপ ও দুর্দশা খানিকটা কেটে যাবার পর বাঙালি মধ্যবিত্ত বড়ো বড়ো জলার জোঁকের মতো চেপে বসেছে সাধারণ মানুষের উৎপাদনশীল শ্রমের উপর। বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছে বা দেখিয়েছে কেউ

কেউ কখনো কখনো হয়তো জেলেও গেছেন অনেকে। এমনকি প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছেন। [সত্তর দশক, প্রথম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ১৬][১৪৩]

উপরিউক্ত মন্তব্যের প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় 'সাগিনা মাহাতো' গল্পটিতে। পাহাড়ি রেলের মজদুর বুড়ো গুরুং-এর মুখে শুনতে পাওয়া যায় বিদেশি মালিকদের নানা অত্যাচারের কথা।

হাঁ। গরিব আছি, মজদুর আছি, কুলি আছি। খালি লাথ মারছে। তো গোরা হতাম কি ফিরিঙ্গি, আমিও লাথ মারতাম। আর বাঙালি ক্লার্কবাবু হতাম তো জেব ভরতাম গরিবের পাকিট মেরে। আচ্ছা বাবা মরো। কোনো সংগঠন তো ছিল না। লিডার ভি না। তো কি করব। আজ আমাকে লাথ মারছে সাহাব তো উশালা হাসি করছে। কাল ওকে মারছে তো আমি হাসি করছি। হাঁ সচ বাত। বিলকুল সচ। তো কি করব। আমি একেলা কিছু বলব সাহাবকে তো সব শালা ভাগবে। কেউ মদত দিবে না। আমি শালাকে পাকড়াবে, সাহাব। দনাদ্দন দনাদ্দন পিটবে। নোকড়ি ভি ফৌরণ খতম। [পৃ. ২৪১][১৪৪]

বুড়ো গুরু-এর মতো পাহাড়ি রেলের বহু মজদুরকে বিদেশি মালিকের বহু অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। এছাড়া কত মজদুর মারা গেছে রোগে ভুগে। মজদুরদের অবিচারের রাজত্বে আবির্ভাব হয় সাগিনা মাহাতোর মতো নেতার। যে মজদুরদের নিয়ে দল গঠন করে। গোরা অফিসার, ফিরিঙ্গি অফিসারদের দাপট আর বাঙালি ক্লার্ক বাবুদের শয়তানি মজদুরদের গড়ে তোলা দলকে দিনের পর দিন শক্ত করে তুলল। ট্রেড ইউনিয়নগুলোতে শ্রমিক মালিকের সংঘর্ষের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের চাপ। এইরকম পরিস্থিতিতে সাগিনা মাহাতো বলেছিল—

দেখ কামরেড, এই পড়া-লিখা খেলায় কাম চলবে না। ছ'মাস ধরে খুট খুট চিঠি লিখছ, ভেজছ। ও শালারাও ঘুট ঘুট চিঠি লিখছে, ভেজছে। লেকিন ফায়দা কি হচ্ছে। তোমাদের এই নয়া তরিকায় এদের কাছ থেকে কাজ আদায় করা যাবে না। পুরানা রাস্তা ধরতে হবে। পিটতে হবে শালাদের, চাকা বন্ধ করতে হবে। তখন দেখবে, শালারা এসে বাপ বলছে।.....যার ঘরে খানাপিনার দানাপানি আছে তারা দেরি করতে পারে, ধৈর্যও করতে পারে। কিন্তু ভুখা নাঙ্গা মজদুর ধৈর্য পাবে কোথায়। খেতে দাও, পরতে দাও, কাজ নাও। গোলমাল কেউ করবে না। কিন্তু দানাপানি দেবে না, খালি বাত, খালি ওয়াদা, ওতে কাম চলে না। এবার আখেরি লড়াই হবে। পিছু ফায়াসালা দোসরা রাস্তা আর নেই। [পৃ. ২৪৩][১৪৫]

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা খুবই ঘোরালো হয়ে উঠেছিল। গোটা লাইনে ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়েছিল। তখন চারিদিকে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। এরই মধ্যে সাগিনাদের ইউনিয়ন বে-আইনি ঘোষিত হয়েছিল। সাগিনা তার অনুচরদের নিয়ে গা ঢাকা দিল এবং আড়াল থেকে ধর্মঘট চালাতে লাগল। একটি মজদুরও কাজে যোগ দিল না। কোম্পানি একখানি গাড়িও চালাতে পারল না। তখন বাংলা তথা ভারতের শাষকবর্গ ফ্যাসিস্টবিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল। শ্রমিক আন্দোলনের আগুনও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্বকারীর গভর্নমেন্টকে চাপ দেয় একটা প্রগতিশীল শ্রমিক নীতি গ্রহণ করার জন্য। 'দুনয়ার মজদুরের স্বাধীনতা ফ্যাসিস্ট হামলায় বিপন্ন তখন পার্টির গোপন মিটিং-এ ঠিক হল, ইউনিয়নের উপর পার্টির কর্তৃত্ব স্থাপন করতে হবে। তা না হলে পার্টির পলিশি অনুসারে ইউনিয়নকে চালানো যাবে না। কোম্পানিগুলি পার্টির শরণাপন্ন হয়েছে। পার্টি আর কোম্পানির উচ্চ মহলের সঙ্গে ঘন ঘন বৈঠক বসে এবং ইউনিয়নের বিরুদ্ধে চুক্তি নামা তৈরি হয়। ইউনিয়নকে আবার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তারা ঠিক করল—

বড় মাইনের একজন লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসারের পদ সৃষ্টি হল। আর এই প্রথম কোনও সাহেব নয়, কোনও বাবু নয়, মজদুরদের আস্থাভাজন একজন সত্যিকারের মজদুরকে সেই পদে বসাতে কোম্পানি স্বীকৃত হল। মজদুরদের জয়জয়কার পড়ে গেল।...শ্রমিকদের যা কিছু কল্যাণ তা কোম্পানীকে করতে হবে লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসারের পরামর্শ মতো। মজদুররা ভোট দিয়ে যাকে পাঠাবে সেই পাবে এই পদ। কোম্পানীর কোনও কারচুপি এতে চলবে না। [তদেব, পৃ. ২৪৬][১৪৬]

নিখিল ভারত মজদুর ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হয় সাগিনাকে। দেড় বছর সাগিনাকে কখনো মাদ্রাজ, কখনো গুজরাট, কখনো বিহার প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গায় তাকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। এরই মধ্যে শিলিগুড়ির ইউনিয়নে দলাদলি শুরু হয়ে যায়। মজদুরদের মধ্যে অভিযোগ পুঞ্জীভূত হয়ে জমে উঠেছিল। শেষে এক ইউনিয়ন থেকে তিন ইউনিয়ন হয়ে গেল। সাগিনার বিরুদ্ধে মজদুরদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হতে থাকে। আর সেই ক্ষোভের ফল হল, নিজের শ্রেণির হাতে অর্থাৎ পরিচিত মানুষদের হাতে তার মৃত্যু। মজদুরদের ক্রোধ, ঘৃণার উন্মত্ত ফলশ্রুতি সাগিনার মৃত্যু। সুতীব্র বিদ্বেষের জ্বালায় বাহাদুরের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠে। দেখে মনে হয় চোখ দুটো যেন ঘৃণার লিকলিকে ছুরি। সাগিনাকে দেখে বলে ওঠে—'ভাগো ভাগো ভাগো। শালা দালাল। কুত্তিকা বাচ্চা আর সাহাব বন গিয়া হ্যায়।' [পৃ. ২৫২][১৪৭] অন্যদিকে বুড়ো গুরং কাঁপতে কাঁপতে সাগিনার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে—

'দেখ শালে, ক্যায়া হাল' হুয়া হামলোগকো। না খানা মিলা না পহেননা। আউর তু বড়ে সাহাব বন গ্যয়া। শালে কো লুহমে থুক ঢাল।

থুঃ করে থু থু ছুঁড়ল গুরুং।

সাগিনা চেঁচিয়ে উঠল, 'ভাইও, সাথীও'—

তার গলা ডুবে গেল তুমুল কোলাহলে।

'মার ডাল শালাকো। পিটো।'

কে যেন চেঁচিয়ে উঠল। তারপর, মুহূর্তের মধ্যে উন্মত্ত জনতা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। কিল ঘুষি লাথির উত্তাল তরঙ্গে সাগিনা খাবি খেতে লাগল। কতবার উঠতে চেষ্টা করল। কতবার চেষ্টা করল কথা বলতে। কিন্তু বৃথা। সেই প্রচণ্ড মারের বেগ ঠেলে সগিনা না পারল মাথা তুলতে, না পারল টু শব্দ করতে। [সমগ্রন্থ, পৃ, ২৫২-২৫৩][১৪৮]

কিন্তু সাগিনার শেষ বক্তব্য থেকে পরিষ্কার যে, সে পার্টি ও কোম্পানির ষড়যন্ত্রের শিকার।

> লেকিন কমরেড, আমার হাত চেপে ধরল সাগিনা। বলল, 'এক ধোঁকাবাজিতে আমি ফেঁসে গিয়েছিলাম। আমি তা বুঝতে পারিনি। হাঁ, মজদুরের ভাল করার নাম করে আমি খালি মজা করে কাটিয়েছি। খালি বন্দর নাচ নেচেছি।[১৪৯]

পরদিন শুকনা ফরেস্টে সাগিনার রেলে কাটা দেহটা পাওয়া যায়। রেল লাইনের পাশেই উপুর হয়ে পড়েছিল। 'কেউ বলে—সে খুন হয়েছে ; কেউ বলে—আত্মহত্যা করেছে।' [সমগ্রন্থ, পৃ. ২৫৩][১৫০] সাগিনার মৃত্যু কোনো দুর্ঘটনা বা আত্মহত্যা যাইহোক না কেন, এই ঘটনা থেকে এটা বোঝা যায় যে, শ্রমিক আন্দোলনকে স্তিমিত করে দেওয়া পার্টি ও কোম্পানিগুলির উদ্দেশ্য। সাময়িকভাবে সাগিনার মতো ট্রেড আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী নেতাদের খুন করে বা মেরে পিটিয়ে আন্দোলনের রেশকে নিজেদের হাতের মুঠোয় আনতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সাময়িক স্তব্ধতা আন্দোলনকে ঘিরে ফেললেও, এর আগুন ঢিক ঢিক করে জ্বলেছে স্বাধীনতা পরবর্তী সময় পর্যন্ত। এ সম্বন্ধে সহিত্য সমালোচক অনিল আচার্য বলেছেন—

> এদিকে সত্তর দশকে শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে চলেছে ধারাবাহিক বিপর্যয়। এই বিপর্যয়ের কারণ, ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং চূড়ান্ত দায়িত্বহীনতা। শ্রমিকদের কেবল পার্টিগত এবং নির্বাচনী রাজনীতির জন্য অপব্যবহার করাও একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক। ভিতরে ভিতরে মালিকের সাথে শলাপরামর্শ করে শ্রমিকদের সর্বনাশ ঘটানো এক ধরনের পুরোনো ট্রেড ইউনিয়নী অভ্যাস। [সত্তর দশক, প্রথম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ১৯][১৫১]

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রচণ্ড হিংস্রতা আর অন্ধ আতঙ্কের বিভীষিকাময় পরিবেশ তৈরি হয়েছিল তারই চিত্র অঙ্কন করেছেন লেখক তার পরবর্তী গল্পটিতে। ১৯৬৯-৭০ সালের দেশ-কালের প্রেক্ষিতে তিনি রচনা করেন 'আমরা যেখানে' (১৯৭০) গল্পগ্রন্থটি। গল্পগ্রন্থটির দুটি রচনাংশ, এক—'বাঘবন্দির খেলা', 'তলিয়ে যাবার আগে'। ১৯৬৯-৭০ সালের ছাত্র রাজনীতি, খুনোখুনিকে তুলে ধরেছেন লেখক 'বাঘবন্দির খেলা'

রচনাংশটিতে। এই সময়ের সৃষ্টি ছোটকোন ও তারক। যারা ধীরে ধীরে ছাত্রাবস্থাতেই ভিড়ে যায় নানা রাজনৈতিক আখড়াগুলিতে। নেতা মন্ত্রীদের পায়ে পায়ে ঘুরতে থাকে। যেন বডি গার্ড। সত্তরের দশক থেকে পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে তারক ও ছোটকোনদের বাড়বাড়ন্ত দেখতে পাওয়া যায়। তারা ক্রমশ পাড়ার মস্তানে পরিণত হয়। কিন্তু পলিটিকস যে বাঘবন্দির খেলা, বাঘ ফাঁদে না পড়ে যাবে কোথায়—ছোটকোন তা জেনেও খেলায় নেমেছে। খেলার শেষে ভয়াবহ মৃত্যু। এইসব ছেলের এই তো পরিণতি। গল্পটিতে দেখতে পাওয়া যায়—

> এখন সে পাকা ওস্তাদ। আর তার কোনো কিছুতে বাধে না। এক একটা চোট খেয়ে অসায় শিকারগুলো যখন লুটিয়ে পড়ে, গোঙায়, ছটফট করে, মুখে চোখে আতঙ্ক ফুটে ওঠে, ছোটকোন খুব মজা পায়। নিজেকে একটা কেউকেটা বলে মনে হয়। আশেপাশের লোকজন বাড়িঘর ছাড়িয়ে তার মাথা কত উঁচুতে উঠে যায়। এই খেলায় এইটেই বড়ো পাওনা। দেখতে দেখতে চারপাশের মানুষগুলো যেন জাদুবলে নেংটি ইঁদুর হয়ে যায়। কী ভয়! কী ভয়! তখন ভালো লাগে। ছোটকোন এই সময়গুলোতে ভালো লাগার ঘোরে বুঁদ হয়ে থাকে। [সমগ্রন্থ, পৃ. ২৭৮][১৫২]

সত্তর দশকে ছাত্ররাজনীতির বাড়বাড়ন্ত রূপ, বেপরোয়া গুণ্ডাগিরি এবং পেশাদারি রাজনীতির ঊর্ধ্বমুখীনতা—এই সমস্ত কিছুই আমরা লক্ষ করে থাকি। গল্পটিতে ছোটকোনকেও বলতে শোনা যায়—''হাঙ্গামা আজকাল ঘাড়ে এসে পড়ে। এড়িয়ে যাওয়ার কোনও উপায় নেই। ট্রামে-বাসে ফুটপাতে হাঙ্গামা ওত পেতে থাকে। তুই কি ঘরে দরজা এঁটে হাঙ্গামার হাত এড়াতে পারবি? দেখবি পথের হাঙ্গামা লাফ মেরে তোর ঘরে ঢুকবে। দুনিয়া কোথায় আমাদের নিয়ে যচ্ছে জানিনে।" [সমগ্রন্থ, পৃ. ৬৮][১৫৩]

ষাট-সত্তর দশকের যুব ও ছাত্র আন্দোলন কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বা দলের অভিভাবকত্বে বিকশিত হয়নি। এই সময়ের আন্দোলন কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও দলগুলির অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল না। রাজনৈতিক দলগুলির বিরোধিতা সত্ত্বেও আন্দোলনগুলি বিকশিত হয়েছিল। ষাটের দশকের শেষের দিকে ছাত্র যুব আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ষাটের দশক ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসে এক উজ্জ্বলতম অধ্যায়। ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে ছাত্র যুব আন্দোলন বেশি মাত্রায় বিদ্রোহাত্মক হয়ে উঠেছিল। শুধু বাংলা বা ভারতবর্ষের ছাত্র আন্দোলনই বিদ্রোহাত্মক হয়ে উঠেছিল তা নয়, সমস্ত পৃথিবী জুড়েই প্রগতিপন্থী ছাত্র-যুবকেরা বিপ্লবাত্মক হয়ে উঠেছিল। কারণ, সে সময় ছিল পৃথিবীব্যাপী 'নতুন কর্মশক্তির' আবির্ভাবের যুগ। পাশাপাশি ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ চলছিল। অন্যদিকে বাংলার ছাত্ররা প্রায়ই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ডাকে সাড়া দেওয়ার মাধ্যমে বাম এবং কমিউনিস্ট প্রভাবের দিকে রায় দিয়েছিল। সেই রাজনৈতিক ঘটনার বিবরণ লেখক দিয়েছেন গৌরকিশোর ঘোষ জলি আর টুকটুকের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে—

> 'ভিয়েতনামে যে সময় সাম্রাজ্যবাদীদের গুলিতে বোমায় হাজার হাজার সংগ্রামী মানুষ পশুর মতো নিহত হচ্ছে, সে সময় নিশ্চিন্ত মনে ক্লাস করার কথা চিন্তা করাও জঘন্য অপরাধ। এতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকেই মদত দেওয়া হবে।'
>
> 'আমরা ক্লাস না করলে সাম্রাজ্যবাদীর গুলিতে ভিয়েতনামের একটা লোকও মারা যাবে না, এমন গ্যারিন্টি যদি দিতে পারেন তো কেউ ক্লাসে যাব না।'
>
> 'আমেরিকার দালালি যারা করতে চান তারা করতে পারেন। আমরা তাদের কথায় আমাদের কর্মসূচি বদলাব না। কাল ধর্মঘট। যারা দালালি করতে আসবে, তারা নিজের রিস্কে আসবে। তবে দালালি করার পরিণামটা শোচনীয় হয়ে উঠতে পারে।'....
>
> 'বুর্জোয়া সুলভ যুক্তি বিযুক্তির ধার আমরা ধারি না। কাল ধর্মঘট। ধর্মঘট বানচাল করার জন্য যারা দালালি করতে আসবে, হামলা হবার জন্য তারা যেন তৈরি হয়েই আসে।'....'ওদের যুক্তি নেই তাই তার বদলে ওরা গায়ের জোর ফলাচ্ছেন। ওদের বুঝতে দিন হাতিয়ার হিসেবে যুক্তি গায়ের জোর থেকে অনেক বেশি ধারালো।' [বাঘবন্দির খেলা, পৃ. ২৯১][১৫৪]

সমাজের বুর্জোয়া শ্রেণির লোকেরা নিজেদেরকে সমস্ত আন্দোলনের আঁচ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। জজ ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশমন্ত্রী রাজনীতিওয়ালা খবরের কাগজওয়ালা প্রোফেসার মাস্টার ডাক্তার কেরানি—সমাজের যারা গারজন তারা গায়ে হাত দেবার আগে ভাবতে বসে। আট ঘাট চিন্তা করতে থাকে। এ বিষয়ে রণবীর সমাদ্দার তাঁর একটি প্রবন্ধে যে মন্তব্য করেছেন, তা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—

> যখনই ধনবাদী অর্থনীতি ও সমাজে এক সাধারণ সংকট দেখা দিয়েছে, তার বিরুদ্ধে আলোড়নের প্রথম কম্পন উঠেছে শিক্ষিত যুবকদের সারি থেকে। কারণ, তারাই এবং তারাই নিজেদের মধ্যে সমন্বিত করেছে একসারি আশ্চর্যজনক পরিস্থিতিসমূহকে। তারা স্বপ্ন দেখে সর্বাধিক ফলে এই নিপীড়ক সমাজব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্নতা বা দূরত্ব বোধ করেও তারা সবচেয়ে বেশি। তাদের সামাজিক উৎস নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি, তবুও তাদের মাঝে আমরা দেখতে পাই বীরত্ব, শৌর্য উদ্যম, উৎসাহ এবং এক সজীব মনের অ-শ্রেণিসুলভ গুণের প্রদর্শন। তারা যুবক, কাজেই তারা কোনো প্রকার বন্ধসংস্কারমুক্ত, একই সাথে তারা বুদ্ধিজীবী, কাজেই সমাজের শাসকদের স্তোকবাক্য, এবং বাঁধা বুলির কুয়াশা পেরিয়ে দেখতে পায়। তারা সমাজব্যবস্থার অযৌক্তিকতার প্রত্যুত্তর দেয় নিজের যুক্তি ও ন্যায্যতার বোধ দিয়ে। লেনিন যথার্থই তাদের বলেছিলেন, 'বিপ্লবের ঝটিকাবাহিনী।' [বাংলার বিদ্রোহী যুবছাত্র আন্দোলন ঃ ১৯৬৬-৭০, সত্তর দশক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭৩][১৫৫]

ষাটের দশকের শেষদিকে বিশ্বধনতান্ত্রিক সংকট ও ভারতীয় সংকট মধ্যবিত্তশ্রেণিকে অভূতপূর্বভাবে আঘাত করেছিল। সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রের বিভীষিকা ও সংকটগুলির বিরুদ্ধে পেটি বুর্জোয়া শ্রেণির বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়ার কারণ অংশ এই, ছাত্র ও যুবকরা মধ্যবিত্তশ্রেণির সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কাণ্ডারি রূপে দেখা দিয়েছিল। তারা সমাজের প্রচলিত রীতিনীতিকে অস্বীকার করার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে বাংলার রাজনীতিতে ছাত্র আন্দোলনে বাম মতবাদ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। বাংলার ছাত্রসমাজ বরাবরই রাজনীতি সচেতন ছিল। ষাটের দশকের প্রাথমিক পর্যায়ে যুব-ছাত্র আন্দোলন সিপিআই (এম)-এর প্রভাবের আওতায় সংঘটিত হয়েছিল। এই আন্দোলন যত এগিয়েছে দলের ভূমিকা, প্রভাব, নির্দেশ তত অপ্রাসঙ্গিক বাহুল্যমাত্র হয়ে পড়েছে।

১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার আগে তাদের ক্ষমতা প্রচার করার জন্য বিভিন্ন স্কুল কলেজের দেওয়ালে তাদের স্লোগান লিখে প্রচারাভিযান চালাতে থাকে। 'যুক্তফ্রন্ট সরকার সংগ্রামের হাতিয়ার' বা 'বন্দুকের নলেই ক্ষমতার উৎস', কিন্তু দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে নির্বাচন বয়কট করার তত্ত্ব নিয়ে ছাত্রসমাজ প্রচারে নেমেছিল। ছাত্রদের স্লোগান ছিল—

> সাম্রাজ্যবাদের দুটি ফ্রন্ট,
> কংগ্রেস আর যুক্তফ্রন্ট।
> ভোট ভোট করে কারা
> সাম্রাজ্যবাদের দালাল যারা।

[ষাট দশকের ছাত্র আন্দোলন ঃ পশ্চিমবঙ্গ, পৃ. ৮৩-৮৪][১৫৬]

কলকাতা সহ সারা পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র যুব আন্দোলন ও তাদের বিক্ষোভ ক্রমশ বেড়েই চলেছিল। এক্ষেত্রে রণবীর সমাদ্দার-এর দেওয়া একটি তথ্য দেওয়া যেতে পারে—

> ১৯৬৫-তে ছাত্রবিক্ষোভের সংখ্যা ছিল ২৭১, ১৯৬৬-তে বেড়ে দাঁড়াল ৬০৭ এবং এর মধ্যে শতকরা ৪২ ভাগ ঘটনা হিংসাত্মক হয়ে উঠল। অবশ্যই বাংলার তরুণেরা হিংসার জন্য প্রস্তুত ছিল। তার উজ্জ্বল কৃশকায় অবয়ব উত্তেজিত হয়ে উঠত মাও-এর ঘোষণায়—'রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস হল বন্দুকের নল।' স্বভাবতই তাকে নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হল। এবং যে সমাজবিচ্ছিন্ন ভবঘুরেদের সে টেনে এনেছিল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ঘূর্ণাবর্তে, এখন সেই ভবঘুরেরাই আবির্ভূত হল ছাত্র-যুবকদের ঘাতকরূপে। বিদ্রোহী ছাত্রযুবরা দয়া

কাউকে দেখায়নি বা দয়ার কোনো আশাও করেনি। পুলিশ তাকে করে ছাড়ল ফেরারিফৌজ, সে কারান্তরীণ হল, অথবা মহানগরীর পরিত্যক্ত রাজপথে রাত্রির নির্জনতায় গুলিতে প্রাণ দিল। [বাংলার বিদ্রোহী যুবছাত্র আন্দোলন ঃ ১৯৬৬-৭০][১৫৭]

উনিশশো সাতচল্লিশ সালের পর থেকে বাংলার মানুষের জীবন কান্না, ক্ষোভ, হতাশা, হাহাকার আর শূন্যতায় ডুবতে বসেছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দ্রুতহারে বর্ধিত খেতমজুরের সংখ্যা। এছাড়া সমগ্র দেশজুড়ে বেকারসংখ্যা ফুলেফেঁপে উঠেছিল। তার বেশিরভাগটাই ছিল পশ্চিমবাংলায়। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক শৈবাল মিত্র তাঁর একটি প্রবন্ধে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সমগ্র দেশজুড়ে একটি বেকার সংখ্যার পরিসংখ্যান দিয়েছিলেন, তা আমরা এক্ষেত্রে তথ্যের জন্য গ্রহণ করলাম। তিনি দেখিয়েছেন—

বেকার সংখ্যার বৃদ্ধির হার—

প্রথম পরিকল্পনা—৫৩ লক্ষ।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা—৭১ লক্ষ।

তৃতীয় পরিকল্পনা—৯৬ লক্ষ।

চতুর্থ পরিকল্পনা—১৫৬ লক্ষ।

এটা শুধু খাতায় কলমে নথিবদ্ধ শহুরে বেকারসংখ্যা। মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৫ জন শহরবাসীর মধ্যে বেকারের সংখ্যা যখন দেড় কোটির বেশি তখন গ্রামাঞ্চলের বেকারত্ব কোথায় গিয়ে পৌঁছেছিল সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। [ষাট দশকের ছাত্র আন্দোলন ঃ পশ্চিমবঙ্গ, সত্তর দশক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৬][১৫৮]

প্রাবন্ধিক ছাত্র-আন্দোলন সম্পর্কে আরো বলেছেন—

দেশের মধ্যে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংকট চরমে পৌঁছেছিল। সংকটের চাপ সামাজিক শ্রেণিগুলির সঙ্গে ছাত্রদের ওপরেও পড়েছিল। সমস্ত নির্যাতিত শ্রেণিগুলির প্রতিনিধি হিসেবে যে-কোনো সময়ে ছাত্ররাই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সবচেয়ে আগে বিদ্রোহ করে। এবারও তাই হল, ছাত্ররা বিদ্রোহ করল। রাজনৈতিক বিদ্রোহ। বেপরোয়া মধ্যবিত্তের শেষ কামড়। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৮১][১৫৯]

ষাটের দশকে ছাত্র-যুব আন্দোলনকে কেন্দ্র করে প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, বিশেষ করে সমাজে সন্ত্রাসমূলক কাজের সঙ্গে বেশি করে যুক্ত ছিল। এই সময় রাজ্যজুড়ে ছাত্র ফেডারেশন পরিচালিত কলেজ ইউনিয়নগুলির ওপর পুলিশ এবং সমাজ বিরোধীদের হামলা চলতে থাকল। লেখক গল্পে পুলিশ ও সমাজবিরোধীদের সম্পর্কে তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা কী ধরনের মন্তব্য করত তার বিবরণ দিয়েছেন— ছোটোকোনের দাদা বলে—

পুলিশ কিছু করে নাকি আজকাল। এইসব সমাজবিরোধীদের এখন থেকে এইভাবে শায়েস্তা করতে হবে। ধর আর অন দি স্পট শেষ করো। তারপর তার বডিটা ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে রেখে দাও। দেখবে দুদিনে দুর্নীতি ঠাণ্ডা। [বাঘবন্দীর খেলা, পৃ. ২৭৫][১৬০]

আর এই সমস্ত মধ্যবিত্ত ঘরের ছাত্র-যুবকেরাই বিভিন্ন ইলেকশানের বৈতরণী পার করে দেয়। গল্পে গুপী ও হরার অবস্থার বিবরণ দেওয়া হয়েছে—

এম. এল. এ.-দের ইলেকশন পার করলি, কাউনসিলারদের ইলেকশান পার করলি। এত যে হেঁকোড়বাজি গেল, তা কি লাভটা হল? শালাদের এতেও চৈতন্য হয়নি। এখন আবার কলেজের ইলেকশান। [সমগ্রন্থ, পৃ. ২৭৬][১৬১]

ষাটের দশকের শেষের দিকে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে দেখে গল্পের তারকদের মতো বাস্তব ক্ষেত্রেও যুবকেরা ভেবেছিল—

এ শালা যা যুগ না। দল একটা চাই। নামমাত্র সিঁদুর সিঁথিতে ঠেকিয়ে রাখ ছোটকোণ, তারপর যা করছি আমরা তাই করে যাব, বুঝলি, কিন্তু কোন শালা গায়ে হাত দিতে সাহস পাবে না। পার্টিতে না ভিরলেই তুই শালা গুণ্ডা, সমাজ-বিরোধী। আর দলে ভিড়ে গেলে সেই তুই শালাই রেভলিউশনারি, বিপ্লবের সৈনিক। [সমগ্রন্থ, পৃ. ২৭৬][১৬২]

এই দশকেই বিভিন্ন কলেজগুলোতে ছাত্র রাজনীতিকে কেন্দ্র করে নানা সময়ে বিভিন্ন রকম ঝামেলার সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্রদের নিজেদের মধ্যেই দলাদলি সংঘর্ষ বেড়েই চলেছে, রাতদিন খালি নিজেদের মধ্যে বোমা ও গুলির সংঘর্ষ। কলেজের ইউনিয়ন দখলকে কেন্দ্র করে। যেমন—গল্পটিতে তারক ও ছোটকোনের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়।

> একই কলেজে দু'জনের থাকা উচিত নয়। তাতে রোজ নতুন নতুন ঝামেলা। তারকের সঙ্গে ছোটকোনের একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার। হয় এ কলেজে ছাড় না হয় দুনিয়া ছাড়। তারক শালা খুব পারটিবাজি করছে এখন, বড় বড় আওয়াজ দিচ্ছে। [সমগ্রন্থ, পৃ. ২৬৫][১৬২]

ষাট-সত্তর দশকের ছাত্র যুব রাজনীতির সবকিছুই ভালো ছিল তাই নয়। ছাত্র-রাজনীতিকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবাংলার প্রায় সমস্ত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলি রণক্ষেত্রের চেহারা গ্রহণ করেছিল। সেই রণক্ষেত্রের আঙ্গিনা থেকে অনেক সময় স্কুলগুলিও বাদ যায়নি। রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য তারক ও ছোটকোনদের মতো যুব সমাজকে কাজে লাগিয়েছে। তারই চিত্র এঁকেছেন লেখক গল্পটিতে।

(ক) জগদীশ অ্যাকাডেমির হেডমাস্টার। তাঁকে পেটাবার জন্য তারক ছোটকোনকে নিয়ে গিয়েছিল। ছোটকোন বুঝতেই পারেনি এর মধ্যে কোনোও পলিটিক্যাল চাল আছে। জেনেছিল পরে।....
রাত্তির আটটা নাগাদ তারকদের সঙ্গে ছোটকোন জগদীশ অ্যাকাডেমিতে গিয়ে দেখে ছাত্ররা হেডমাস্টারকে তার ঘরে সকাল থেকে ঘেরাও করে রেখেছে। ছাত্ররা ঘরের বাইরে তারস্বরে স্লোগান দিচ্ছে ''ছাত্রদের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করতে হবে করতে হবে'', ''প্রধান শিক্ষকের মুণ্ডু চাই'', 'কায়েমি স্বার্থের দালাল নিপাত যাও নিপাত যাও'', ''প্রধান শিক্ষকের পদত্যাগ চাই, আভি চাই, আভি চাই,'' 'বুর্জোয়া কুত্তা গদি ছোড়, আভি ছোড় আভি ছোড়।'' [সমগ্রন্থ, পৃ. ২৮২][১৬৪]

(খ) ছাত্ররা তুমুল হইহই করল। ছাত্ররা চুপ করলে তারক বলল, ''ছাত্ররা এখানে থাকবে, যেসব ছাত্রদের রাসটিকেট করেছেন ঘেরাও-এর জন্য, তা এখনই প্রত্যাহার করতে হবে, আপনার পদত্যাগপত্র এখনই পেশ করতে হবে। ছাত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে অসম্মানজনক আচরণ করার জন্য এখনই হাতজোড় করে ক্ষমতা চাইতে হবে।''
....''এর যা কিছু পরিণামের জন্য তা হলে আপনিই দায়ী থাকবেন। মত বদলের জন্য আমরা পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতা নষ্ট হতে পারে, এমন কোনও কাজ এখানে হোক, আমরা তা চাই না। কিন্তু আপনার প্ররোচনায় এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতা যদি নষ্ট হয় তা হলে দেশের সমগ্র সংগ্রামী ছাত্রের চোখে তার জন্য আপনিই দায়ী থাকবেন।''
...ছাত্ররাও হেঁকোড়বাজি শুরু করল, ''সংগ্রামী ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ।'' [সমগ্রন্থ, পৃ. ২৮৩][১৬৫]

আর এটাই ছিল ষাট-সত্তর দশকের ছাত্র-যুব আন্দোলনের পর্দার আড়ালের আসল রূপ। যা লেখক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার রঙে রঙিয়ে তুলেছেন গল্পটিতে।

'তলিয়ে যাবার আগে' গল্পটি 'বাঘবন্দী' খেলারই শেষ অংশ। প্রথম অংশটিতে ষাটের দশকের শেষ ও সত্তর দশকের গোড়ার ছাত্র রাজনীতির বাড়বাড়ন্ত রূপ, বেপরোয়া গুণ্ডাগিরি এবং পেশাদারি রাজনীতির ঊর্ধ্বমুখীনতা এই সমস্ত কিছুই আমরা লক্ষ করে থাকি। অন্যদিকে 'তলিয়ে যাবার আগে' গল্পটিতে দেখতে পাই লেখক সেখানে দেখাতে চেয়েছেন— গুণ্ডা-মাস্তানরা ক্রমশ সমাজে গভীর অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যারা সমাজের বুকে নানা অসামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত তারা প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। পেশাদার গুণ্ডা হোক বা না হোক, হিংস্রতায় বা নৃশংসতায় ওরা যে কোনো কিছু থেকে পিছু হটবে না তা লেখক গল্পটিতে দেখিয়েছেন। গল্পটিতে লিলিকে কারা অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল তারা প্রত্যেকেই মধ্যবিত্ত ঘরেরই ছেলে। লিলির বিবরণের মধ্য দিয়ে তা স্পষ্ট—

> যে তিনজন তাকে অপহরণ করেছিল, তারা সবাই এই মধ্যবিত্ত পরিবারেরই ছেলে। এবং স্বাভাবিক জীবন এদের প্রত্যাখ্যান করেছে। পরিবারের আকর্ষণ এদের কাছে শিথিল হয়ে এসেছে, সমাজ বলে কোনও ধারণাই এদের মনে গড়ে ওঠেনি। এরা ব্যর্থ, ভাই বাপ-মায়ের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা বোধ করে। এই লজ্জা আরও অসহনীয় হয়ে ওঠে, যখন এদের নিতান্ত নিরুপায় হয়ে ক্ষিধের জ্বালায় মানমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে চোরের মতো

বাড়িতে ফিরে গিয়ে ভাতের থালা টেনে নিয়ে বসতে হয়, বসতে এরা বাধ্য হয়। এই কয়েকটা মিনিট হচ্ছে ওদের জীবনে সব থেকে যন্ত্রণাদায়ক মুহূর্ত। সেই অন্নের প্রতিটি গ্রাস ওদের স্মরণ করিয়ে দেয় ওরা অপদার্থ, ওরা অনধিকার প্রবেশ করেছে, এই ভাতের থালায় ওদের কোনও অধিকার নেই, এ ভিক্ষে। ওরা অস্থির হয়ে ওঠে। ওরা প্রচণ্ডভাবে ফেটে পড়তে চায়, পড়েও, যে-কোনও অজুহাতে। মনে সারাক্ষণ নিরুপায় অন্ধ ক্রোধ ধিক-ধিক জ্বলতে থাকে। এবং সেই আগুনের তাপের পরিমাণ দু'হাজার ফারেনহাইট এর কিছু কম নয়। এই উত্তাপে ন্যায়নীতিবোধ হিতাহিত জ্ঞান গলে যাবে, এ আর বিচিত্র কী?" [সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৩২][১৬৬]

'তলিয়ে যাবার আগে' গল্পটি প্রায় সম্পূর্ণভাবে সমাজ মনস্তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এক্ষেত্রে বলা যায় রাজনীতি সমাজকে বাদ দিয়ে নয়। কারণ, সমাজের প্রত্যেকটি স্তরে রাজনীতির ভাঙা-গড়ার নানা খেলা নিত্য চলমান।

গৌরকিশোর ঘোষের 'গল্পসমগ্র' গ্রন্থের পরবর্তী গল্পগুলির মধ্যেও বেশি করে সমাজ মনস্তত্ত্বের ভাবনাই প্রকটিত হয়েছে। সমাজ মনস্তত্ত্বের মধ্যেই লেখক তৎকালীন রাজনৈতিক ভাঙা-গড়াকে দেখিয়েছেন। 'পশ্চিমবঙ্গ এক প্রমোদতরণী, হা হা' গল্প সংগ্রহের গল্পগুলি ১৯৭১ সালে প্রকাশিত হয়। গল্পগুলির মধ্যে বিশেষ করে 'হঠাৎ জোয়ার', 'পশ্চিমবঙ্গ এক প্রমোদতরণী, হাহা' গল্পদুটিতে লেখক ১৯৭০ সালের এক নড়বড়ে কলকাতা শহরকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ তখন এক ঝাঁঝড়া প্রমোদতরণী। কোথাও কোনও নিয়ম নেই, শৃঙ্খলা নেই, চারিদিকে শুধু অরাজকতা। তারা সব কিছুই মেনে নিচ্ছে, মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। মানুষের মেরুদণ্ড একেবারে ভেঙে গেছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে তারা ভুলে গেছে। যে কলকাতার কথা লেখক বলেছেন, সেটি একসময় ছিল সিটি অব দি ব্রিটিশ এম্পায়ার। আর বাংলাদেশের রাজধানী। এখন সেই কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের এক নড়বড়ে শহরমাত্র। কলকাতা শহরের মানুষগুলো মেরুদণ্ডহীন 'আরশোলায়' পরিণত হয়েছে। সত্তর দশকে কলকাতায় প্রায় রোজই কিছু না কিছু লেগেই ছিল। যে কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে কলকাতা শহর উত্তাল হয়ে উঠত। ট্রাম-বাস পোড়ানো টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া এগুলি ছিল কলকাতা শহরের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা।

কাঁদানে গ্যাসের প্রথম শেলটা একটু দূরে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল। বাসের জানালা থেকে স্পষ্ট দেখল বিজলী। রাস্তার মাঝ বরাবর জিনিসটা এসে পড়ল। ঘন জমাট ধোঁয়া পাক খেয়ে উপরের দিকে উঠতে না উঠতেই একটা কমবয়সী ছেলে সেটাকে চিলের মতো ছোঁ মেরে তুলে নিল। ছুঁড়ে মারল উল্টো দিকে। তারপর চোখ মুছতে মুছতে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। বাসের মধ্যে ততক্ষণে হুটোপুটি শুরু হয়ে গিয়েছে। কে আগে নেমে পালাবে—তারই তীব্র প্রতিযোগিতা। [হঠাৎ জোয়ার, পৃ. ৩৪৩][১৬৭]

কাহিনির প্রধান চরিত্র বিজলী কিছুক্ষণ পর দেখতে পেল—

হুড়মুড় করে গোটা চারেক ছেলে টিউবওয়েলের কাছে ছুটে এল। তাদের শরীর থেকে কাঁদানে গ্যাসের ঝাঁঝালো গন্ধ বিজলীর নাকে নতুন করে ঢুকতেই তার গা গুলিয়ে উঠল। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৬৪][১৬৮]

পশ্চিমবাংলা তথা ভারতের রাজনীতিতে ভাঙন শুরু হয়েছিল। যার সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৬৪ সালে জহরলাল নেহরুর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। সেই সময় থেকেই রাজনীতিতে অস্থিরতার ঢেউ লক্ষ করা যায়। এমনকি কমিউনিস্ট পার্টিতেও প্রবল ভাঙচুর এবং নতুন নতুন দল গঠন হতে থাকে। ভবানী সেনগুপ্তের মতে—

স্বাধীনতা-উত্তর রাজনীতির প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। তারপর থেকেই দল ভাঙাভাঙির সূত্রপাত। ভাঙন শুধু কমিউনিস্ট দলে নয়, বামপন্থী দক্ষিণপন্থী সব দলেই, এমনকি কংগ্রেসেও। ১৯৬৯ সালে যখন তৃতীয় কমিউনিস্ট পার্টি জন্মর, কংগ্রেসও তখন দুটো প্রতিষ্ঠানে বিভক্ত ঃ আদি ও নব। [জোয়ারভাটায় ষাট-সত্তর, অমলেন্দু সেনগুপ্ত, দ্বিতীয় পর্ব, পৃ. ৫১][১৬৯]

অনেকেই সত্তর দশককে মুক্তির দশক হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। কারণ সত্তর দশকের বিপ্লবের রথের চাকা চলেছিল রাজপথের মধ্য দিয়ে, গ্রামের আলপথের মধ্য দিয়ে নয়। এক্ষেত্রে শিপ্রা সরকারের মন্তব্যটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—

মুক্তির দশকের স্বপ্ন নিয়ে যারা ১৯৭০ সালকে অভ্যর্থনা করেছিল সেই চরমপন্থীরা তলিয়ে যাচ্ছিল ব্যক্তিহত্যা আর সন্ত্রাসের চোরাবালিতে। [সমগ্রন্ধ, চতুর্থ পর্ব, পৃ. ২০৫][১৭০]

ক্রমশ পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক চালচিত্র পরিবর্তন হয়ে চলেছে। জননেতা থেকে শুরু করে চিকিৎসক ছাত্র-যুব-সাধারণ মানুষ সকলেরই জীবন বিপন্ন হতে বসেছে। এই পরিস্থিতি সম্পর্কে লেখকের নিজস্ব মতটি বিশেষভাবেই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—

> সকলেই আজ সন্ত্রস্ত। নকশালপন্থীরা সন্ত্রস্ত, সি. পি. এম. সন্ত্রস্ত, প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের নেতা, এম. এল. এ., এম. পি. শিক্ষক, ছাত্র, অধ্যাপক, শ্রমিক, কেরানী, সরকারী অফিসার, পুলিশ, সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিক, অভিনতা-অভিনেত্রী, রোগী, ডাক্তার, মোক্তার, জজ, উকিল, ফরিয়াদী আসামী, সর্বশ্রেণীর লোক, ছেলে মেয়ে বুড়ো প্রত্যেকেই আজ পোষাকের তলায় থর থর করে কাঁপছেন।...
>
> ...রাজনৈতিক নেতারা যে সব খুনীকে প্রশ্রয় দিয়েছেন তারা আজ এমনই পেশাদার হয়ে উঠেছে যে দাদাদের শাসন আর মানতে চাইছে না। পাইপগান আর রিভলবারের নলই যে ক্ষমতার উৎস, এ তারা বুঝে ফেলেছে।...
>
> [দেশ, ১৪ জৈষ্ঠ্য ১৩৭৮, জোয়ার ভাটায় ষাট-সত্তর, অমলেন্দু সেনগুপ্ত, চতুর্থ পর্ব, পৃ. ২১০-২১১][১৭১]

লেখকের নিজের কথার প্রতিধ্বনি হয়েছে 'পশ্চিমবঙ্গ এক প্রমোদতরণী, হাহা' গল্পটির বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্য দিয়ে। গল্পটিতে প্রোফেসর হেলমূট তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও কর্মকাণ্ডের বর্ণনা করেছেন। গণতন্ত্রের নামে যে চারিদিকে ধাপ্পাবাজি চলছে, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

> ময়দানের মাইক তারস্বরে বলে চলেছে এই কি গণতন্ত্র। এ তো ধাপ্পা। যে গণতন্ত্র বড়লোককে শুধু বড়োলোক করে আর গরিবের গরিবি আরও বাড়িয়ে দেয়, সেই গণতন্ত্র তো ধাপ্পাবাজি। ঝুটা। [পশ্চিমবঙ্গ এক প্রমোদতরণী হাহা, দৃশ্য আটাশ, পৃ. ৪১৫][১৭৯]

সত্তর দশকের পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অমলেন্দু সেনগুপ্ত বলেছেন—

> পশ্চিমবাংলার সংগ্রামী মানুষের মনোবল চূর্ণ করার জন্য রাষ্ট্রশক্তি বদ্ধপরিকর। গোটা ১৯৭০ সাল জুড়ে চলল দমন-নিপীড়ন অত্যাচারের স্টিম রোলার। যেন এক হিংস্র শ্বাপদ দাঁত নখ দিয়ে ছিঁড়ে খুঁড়ে খাচ্ছে তার শিকার। [জোয়ারভাটায় ষাট-সত্তর, চতুর্থ পর্ব, পৃ. ২১৭][১৭৩]

গল্পটিতে লেখক দেখিয়েছেন—

> কখনও পূজোর চাঁদার নামে, কখনও পার্টির চাঁদার নামে জুলুম বেড়েই চলেছে। ফলে বাসওয়ালারা বিনা নোটিসে বাস বন্ধ করে দিচ্ছে। খুন জখম বাড়ছে। স্কুলে ঢুকে শিক্ষককে মারছে বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে। বাড়ি চড়াও হয়ে খুন করছে। স্কুলে শিক্ষিকার বুকে বিঁধছে ছুরি। সবাই আমরা চুপ করে আছি। আর মাথা তুলতে সাহস পাই না কেউ। খাচ্ছি, দাচ্ছি, রমণ করছি, আর সিনেমা দেখছি, আর চায়ের দোকান, কফি হাউসে জাঁকিয়ে বসে রাজাউজির মেরে চলেছি। [পশ্চিমবঙ্গ এক প্রমোদতরণী, হা হা, পৃ. ৪১৬][১৭৪]

গল্পটির তেরো ও চোদ্দো নং দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই—দুটি বীভৎস চিত্র—

(ক) বাসের ভিতর থেকে একটি গুণ্ডা ছেলে একজনকে টেনে হিঁচড়ে নামাচ্ছে। সে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে, আমাকে বাঁচান। আমাকে খুন করে ফেলবে। সবাই চুপ। বাঁচান বাঁচান বাঁচান।

ছেলেটাকে নামিয়ে গুণ্ডাটা সকলের সামনেই তার পেটে ছুরি ঢুকিয়ে দিল। ছেলেটা বাবাগো বলে নিদারুণ এক চিৎকার করে গোঙাতে লাগল, সবাই চুপ। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৪১০][১৭৫]

(খ) স্কুলের দোতালার ক্লাস থেকে চারটি চেলে পাইপগান, লোহার রড দিয়ে একটি ছেলেকে টেনে হিঁচড়ে আনছে। ছেলেটি চেঁচাচ্ছে জ্ম স্যার বাঁচান! বাঁচান! বাঁচান! আমাকে খুন করবে। বাঁচাও। কে আছ বাঁচাও। পুলিশে খবর দাও।....

ছেলেটাকে ওরা হিঁচড়াতে হিঁচড়াতে নিয়ে যাচ্ছে। ছেলেটা যা পাচ্ছে, প্রাণপণে আঁকড়ে ধরছে।... স্যার আমাকে বাঁচান। একটা ছেলে লোহার রড পিটে ওর হাতের আঙুল ছেঁচে দিল। ওর মুঠো আলগা হয়ে পড়ল। বাঁ-চা-ও, বাঁ-চা-ও! ওরা ওকে হিঁচড়ে হিঁচড়ে নিয়ে গেল। ছেলেটা পেচ্ছাব করে ফেলল। বাঁচাও বাঁচাও!

...একটা ছেলে তার কানে পাইপগান ঠেকিয়ে গুলি করল। তারপর ওকে ফেলে রেখে নিরুত্তেজভাবে বেরিয়ে গেল। ছেলেটা পড়ে গিয়ে কিছুক্ষণ ধড়ফড় করল। তারপর ঠাণ্ডা। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৪১১][১৭৬]

অর্থাৎ যতদিন এগিয়েছে কলকাতা শহরের বুকে গুণ্ডাদের দৌরাত্ম্য বেড়েই চলেছে।

> রেড রোডটা ক্রমশ লম্বা হয়ে চলেছে। মেশিন থেকে যেমন কাগজ বের হয়, অনেকটা সেই কায়দায়। রেড রোড ক্রমশ লম্বা হতে হতে সরু হতে হতে সোজা দিগন্তে গিয়ে মিশল। পথের এক পাশে হিংস্র, ক্রুদ্ধ বিরাট একদল তরুণ ও যুবা, ভদ্র-অভদ্রের রকমারি ভিড়, হাতে লোহার রড, সাইকেলের চেন, ছুরি বোমা, পাইপগান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পথের অন্যধারে উদ্যত রাইফেল ও রিভলভারধারী পুলিশ ফোর্স। আর পথের ঠিক মাঝখান দিয়ে চলেছে কলকাতার অগণিত নাগরিকের, আবালবৃদ্ধবণিতার নিঃশব্দ মিছিল। এরা যেন রোমক বা মিশরীয় সাম্রাজ্যের পায়ে বেড়ি দাসের দল, যারা শুধু অন্যের হুকুম নতমস্তকে মানতেই জানে। মাথা নিচু করে, নিজেকে ভাগ্যের হাতে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দিয়ে ওদের মিছিল চলেছে দিগন্তের দিকে নিয়তির দিকে। [সমগ্রন্থ, পৃ. ৪১৪][১৭৭]

মানুষ ক্রমশ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে ভুলে গেছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সাহসও তারা হারিয়ে ফেলছে। এমনকি গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্যও কেউ রুখে দাঁড়ায়নি। সত্তর দশকের পশ্চিমবাংলার রক্তাক্ত ও খুনোখুনির পরিবেশে রাম বসু 'কানামাছি' নামক একটি কবিতা লিখেছিলেন—

> চোখে ছানি
> হাতে ছোরা
> রক্তাক্ত সময়
> মাটিতে লুণ্ঠিত লাল
> হিম দেহ জেগে আছে ছুরি।
> ... ...
> নিভে যায় পড়শিদের সতর্ক জটলা
> পুনরায়, কিছু পরে
> সাজানো সংসার, সাজা, সিনেমা বোনাস
> পুনরায় ঘুষখোর মিছিলে সংগ্রামী
> ধোঁয়া-ওঠা ঘেয়ো দৃশ্যপট। [জোয়ারভাটায় ষাট-সত্তর, পৃ, ২১১][১৭৮]

রাজ্যের খুনোখুনি সম্বন্ধে প্রমোদ দাশগুপ্ত বীরেন রায়কে বলেছিলেন—

> এ নিয়ে বেশি মাথা ঘামালে নিজেই খুন হয়ে যাবেন। যা ঘটছে তার উপর হয়তো নেতাদের নিয়ন্ত্রণ নেই। এই বদলে যাওয়া পটভূমিতে সিপিএম, সিপিআই, নকশাল সবাই আক্রমণকারী এবং আক্রান্ত। সকলেরই হাতে রক্ত। এই গোলমেলে সময়ে কে যে আততায়ী আর কে যে আক্রান্ত ঠাহর করা কঠিন একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে।" [সমগ্রন্থ, পৃ. ২১১][১৭৯]

লেখক 'পশ্চিমবঙ্গ এক প্রমোদতরণী হা হা' গল্পটিতে যে বাস্তবতার চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তা এক কথায় ভবিষ্যতে সাহিত্যের জগতে মাইলস্টোন বা মাইলফলক বিশেষ। ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত শহর কলকাতায় যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয়েছে, বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক নানা ঘাত প্রতিঘাত সাধারণ মানুষের জীবনকে কঠিন সংঘাতের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে, সেই কাহিনিই নিশ্চিভাবে ধরা আছে গল্পগ্রন্থটিতে। আলোচ্য গল্পগ্রন্থটি সম্পর্কে সাহিত্যিক বিমল কর বলেছেন—

> গল্পের বিষয়গুলি সাম্প্রতিক ; অর্থাৎ বর্তমান সময়ের চিত্র। যাকে বলা হয়—a sense of the present in its essence. [ভূমিকাংশ][১৮০]

তবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, দায়িত্বহীনতা এবং স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বসবাস করছে। তাদেরই কথা লেখক গল্পগুলিতে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।

আমাদের আলোচ্য অধ্যায়টির বিষয় ছিল 'রাজনীতির ভাঙা গড়া ; উপন্যাস ও গল্পে তার প্রতিফলন'। আমরা এযাবৎ উপন্যাস ও গল্পে কাহিনি-উপকাহিনির সঙ্গে স্বাধীনতা পূর্বসমসাময়িক এবং স্বাধীনতা, উত্তর রাজনৈতিক

পরিস্থিতিকে লেখক কীভাবে সত্য ও যুক্তিনিষ্ঠ এবং স্পষ্টরূপে চিত্রিত করেছেন তারই বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি মাত্র। লেখক গৌরকিশোর ঘোষের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ তখনই সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব বলে আমার মনে হয়েছে, যখন তাঁর 'রূপদর্শী সংগ্রহ'-এর (২) রাজনৈতিক রচনাভাষ্য আলোচনা করা হবে। আসলে রূপদর্শী তো প্রধানত ভাষ্যকার, প্রদর্শক। সংবাদ রকমফেরের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক সত্যের কাঠামোকে জানানোই তাঁর ভাষ্যের প্রধান কাজ। তিনি বিভিন্ন ভাষ্যের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা-উত্তর রাজনৈতিক নানা টানাপোড়েনকেই দেখিয়েছেন। আমরা অধ্যায়টির সূচনাতেই বলেছি যে, লেখক একজন রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তি। তাঁর উপন্যাস ও গল্পে চিত্রিত নানা রাজনৈতিক ঘটনাগুলি কোনও কল্পনার জালে বোনা নয়, সত্যের ভূমি থেকে উদ্‌গত। রাজনৈতিক সত্য ভাষ্যের জন্য তাঁকে জেলে যেতে হয়েছিল। ১৯৭৬ সালে প্রেসিডেন্সি জেলে বসে লেখক তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর পুত্রের প্রতি প্রতিবাদ প্রকাশ করে লিখেছিলেন—

> আসুন, আমরা মিথ্যাকে উন্মোচন করি এবং সত্যকে প্রকাশ করি। আসুন, আমরা নিগ্রহ ভোগের দ্বারা প্রসন্ন চিত্তে সন্ত্রাসকে পরাভূত করি। আসুন, আমরা স্বৈরচারী প্রশাসন ব্যবস্থার সঙ্গে সর্বতোভাবে অসহযোগিতা করি। আসুন, আমাদের সব ভালোবাসা স্বাধীনতায় অর্পণ করি। আসুন, অহিংসায় দীক্ষিত হই, কারণ অহিংসাই গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার শক্তি রাখে। এবং আজ, প্রজাতন্ত্রী দিবসে আসুন, উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করি দাসত্ব নয়, দাসত্ব নয়, স্বাধীনতা। স্বৈরাচার নয়, গণতন্ত্র। আসুন সমবেতভাবে গেয়ে উঠি;
>
> স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে হায় হে কে বাঁচিতে চায়
> দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে কে পরিবে পায়।
> জয় হোক গণতন্ত্রের, জয় হোক প্রেমের। জয় হোক মানুষের।
> [দাসত্ব নয়, দাসত্ব নয়, স্বাধীনতা, পৃ. ২২][১৮১]

অর্থাৎ লেখক উপন্যাস ও গল্পে যে সমস্ত রাজনৈতিক ঘটনার বিবৃতি দিয়েছেন তা যথার্থ এবং পাঠক সাধারণের কাছে তা এক পরম প্রাপ্তি হিসেবেই ধরা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. অম্লান দত্ত, 'ওকে যেমন দেখেছি', দেশ, ২০ জানুয়ারি, ২০০১।
২. দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আমাদের যৌবন ও স্বাধীনতা', দৈনিক 'স্বাধীনতা' ২৫.১২.১৯৬০।
৩. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৯৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৯, অগ্রহায়ণ ১৪১৬, পৃ. ১৮৩।
৪. অলোক রায় সম্পাদিত, সাহিত্য কোষ গল্প কথাসাহিত্য, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল, ১৯৬৭, পৃ. ১৮৩।
৫. গৌরকিশোর ঘোষ, গল্প সমগ্র গল্প প্রথম সংস্করণ মে, ২০০৩, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ 'ভূমিকা'।
৬. সমগ্রন্থ, 'ভূমিকা'।
৭. অমলেন্দু সেনগুপ্ত, উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব, দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা, প্রথম প্রতিভাস সংস্করণ গল্প আগস্ট ২০০৬, প্রথম প্রকাশ গল্প ১৯৮৯।
৮. সমগ্রন্থ, পৃ. ১২।
৯. সমগ্রন্থ, পৃ. ১২।
১০. সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা, রামমোহন থেকে মানবেন্দ্রনাথ, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ১৯৬৮, পুনর্মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৪, পৃ. ১৩৭।
১১. সমগ্রন্থ, পৃ. ৪২২।
১২. গৌরকিশোর ঘোষ, জল পড়ে পাতা নড়ে, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, মে ১৯৭৮, পঞ্চম মুদ্রণ মে ২০১৩, পৃ. ১২১।
১৩. সমগ্রন্থ, পৃ. ৫৩।
১৪. সমর কুমার মল্লিক, আধুনিক ভারতের রূপান্তর রাজ্য থেকে স্বরাজ্য (১৮৫৮-১৯৪৭), প্রথম প্রকাশ গল্প জানুয়ারি, ১৯৯৬, ত্রয়োদশ প্রকাশ, মার্চ, ২০১৪-২০১৫, পৃ. ৪৮৫।
১৫. গৌরকিশোর ঘোষ, জল পড়ে পাতা নড়ে, প্রথম আনন্দ সংস্করণ মে ১৯৭৮, পঞ্চম মুদ্রণ মে ২০১৩, পৃ. ৫৩।
১৬. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৫৪।

১৭. সমগ্রন্থ, পৃ. ১২২।
১৮. সমগ্রন্থ, পৃ. ১২২-১২৩।
১৯. সমগ্রন্থ, পৃ. ১২৩।
২০. সমগ্রন্থ, পৃ. ১১৪।
২১. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গা থেকে দেশভাগ ঃ ফিরে দেখা, ছেচল্লিশের দাঙ্গা, পৃ. ২১।
২২. গৌরকিশোর ঘোষ, জল পড়ে পাতা নড়ে, প্রথম আনন্দ সংস্করণ মে ১৯৭৮, পঞ্চম মুদ্রণ মে ২০১৩, পৃ. ২২৬।
২৩. সমগ্রন্থ, পৃ. ২২৭।
২৪. সমগ্রন্থ, পৃ. ২২৭।
২৫. সমগ্রন্থ, পৃ. ২২৭।
২৬. সমগ্রন্থ, পৃ. ২২৯।
২৭. সমগ্রন্থ, পৃ. ২২৯।
২৮. সন্দীপ বন্দ্যোপাধায়, দাঙ্গা থেকে দেশভাগ ঃ ফিরে দেখা, ছেচল্লিশের দাঙ্গা।
২৯. গৌরকিশোর ঘোষ, প্রেম নেই, প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৮১, ত্রয়োদশ মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১৬১।
৩০. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৬৩।
৩১. গৌরকিশোর ঘোষ, জল পড়ে পাতা নড়ে, প্রথম আনন্দ সংস্করণ মে ১৯৭৮, পঞ্চম মুদ্রণ মে ২০১৩, পৃ. ২৪৭।
৩২. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৪৭।
৩৩. গৌরকিশোর ঘোষ, প্রেম নেই, প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৮১, ত্রয়োদশ মুদ্রণ জানুয়ারি, ২০১৪, পৃ. ১৬২।
৩৪. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৬৬।
৩৫. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৬৭।
৩৬. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৮১।
৩৭. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৮২।
৩৮. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৮২।
৩৯. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৮৩।
৪০. সমগ্রন্থ, পৃ. ২১৪।
৪১. সমগ্রন্থ, পৃ. ২১৪।
৪২. সমগ্রন্থ, পৃ. ২১৭।
৪৩. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৪৯।
৪৪. সমগ্রন্থ, পৃ. ২২৫।
৪৫. সমগ্রন্থ, পৃ. ২০৬।
৪৬. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৫৪।
৪৭. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৫৪।
৪৮. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৫৫।
৪৯. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩১১।
৫০. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩১১।
৫১. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৭৭।
৫২. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৭৭।
৫৩. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৭৮।
৫৪. অমলেন্দু সেনগুপ্ত, উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব, দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা, প্রথম প্রতিভাস সংস্করণ, আগস্ট ২০০৬, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯, পৃ. ১৭৪।
৫৫. গৌরকিশোর ঘোষ, প্রেম নেই প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৮১, ত্রয়োদশ মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ২৯০।
৫৬. অমলেন্দু সেনগুপ্ত, উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব, দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা, প্রথম প্রতিভাস সংস্করণ, আগস্ট ২০০৬, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯, পৃ. ১৭৩।
৫৭. গৌরকিশোর ঘোষ, প্রেম নেই, প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৮১, ত্রয়োদশ মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৩২৭।
৫৮. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৩৭।
৫৯. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৩৯।
৬০. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৩৯।
৬১. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৪০।

৬২. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৪০।
৬৩. গৌরকিশোর ঘোষ, প্রতিবেশী, প্রথম সংস্করণ আগস্ট ১৯৯৫, তৃতীয় মুদ্রণ জুলাই ২০১২, পৃ. ১০।
৬৪. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৫৮।
৬৫. সমগ্রন্থ, পৃ. ৮৩।
৬৬. সমগ্রন্থ, পৃ. ৮৮।
৬৭. সমগ্রন্থ, পৃ. ৮৬।
৬৮. অমলেন্দু সেনগুপ্ত, উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রথম প্রতিভাস সংস্করণ জ্ম আগস্ট ২০০৬ ; প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯, পৃ. ২৩।
৬৯. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৪।
৭০. গোপাল হালদার, মন্বন্তরের তিনপর্ব, প্রকাশভবন, প্রথম প্রকাশ জ্ম অক্টোবর, ১৯৪৪, প্রথম অখণ্ড প্রকাশভবন সংস্করণ জ্ম জানুয়ারি, ২০১৫, তৃতীয় খণ্ড, তেরশ পঞ্চাশ, পৃ. ৬৩৯।
৭১. গৌরকিশোর ঘোষ, প্রতিবেশী, প্রথম সংস্করণ আগস্ট ১৯৯৫, তৃতীয় মুদ্রণ জুলাই ২০১২, পৃ. ১১৩।
৭২. গোপাল হালদার, মন্বন্তরের তিনপর্ব, প্রকাশভবন, প্রথম প্রকাশ জ্ম অক্টোবর, ১৯৪৪, প্রথম অখণ্ড প্রকাশ ভবন সংস্করণ জ্ম জানুয়ারি, ২০১৫ তৃতীয় খণ্ড, তেরশ পঞ্চাশ, পৃ. ৬১৭।
৭৩. গৌরকিশোর ঘোষ, প্রতিবেশী, প্রথম সংস্করণ আগস্ট ১৯৯৫, তৃতীয় মুদ্রণ জুলাই ২০১২, পৃ. ১৫৫।
৭৪. নরহরি কবিরাজ, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা', মনীষা, প্রথম সংস্করণ মাচ ১৯৫৪, পঞ্চম প্রকাশ জ্ম জুলাই, ১৯৮৬।
৭৫. গৌরকিশোর ঘোষ, প্রতিবেশী, প্রথম সংস্করণ আগস্ট ১৯৯৫, তৃতীয় মুদ্রণ জুলাই, ২০১২, পৃ. ১৯২।
৭৬. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৯৪।
৭৭. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৯৮-১৯৯।
৭৮. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৪০।
৭৯. অমলেন্দু সেনগুপ্ত, উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রথম প্রতিভাস সংস্করণ জ্ম আগস্ট ২০০৬, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯, পৃ. ৪৩-৪৪।
৮০. গৌরকিশোর ঘোষ, প্রতিবেশী, প্রথম সংস্করণ আগস্ট ১৯৯৫, তৃতীয় মুদ্রণ জুলাই ২০১২, পৃ. ২৪১।
৮১. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৪১।
৮২. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৪১।
৮৩. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৪১।
৮৪. অমলেন্দু সেনগুপ্ত, উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রথম প্রতিভাস সংস্করণ, আগস্ট ২০০৬, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯, পৃ. ৯৩।
৮৫. গৌরকিশোর ঘোষ, প্রতিবেশী, প্রথম সংস্করণ আগস্ট ১৯৯৫, তৃতীয় মুদ্রণ জুলাই, ২০১২, পৃ. ২৪১।
৮৬. অমলেন্দু সেনগুপ্ত, উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রথম প্রতিভাস সংস্করণ জ্ম আগস্ট ২০০৬, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯, পৃ. ৯৪।
৮৭. নরহরি কবিরাজ, স্বাধীনতার-সগ্রামে বাঙলা প্রথম সংস্করণ মার্চ ১৯৫৪, পঞ্চম প্রকাশ জুলাই ১৯৮৬, পৃ. ২৪১।
৮৮. গৌরকিশোর ঘোষ, প্রতিবেশী, প্রথম সংস্করণ আগস্ট ১৯৯৫, তৃতীয় মুদ্রণ জুলাই, ২০১২, পৃ. ২৭৩।
৮৯. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৮৫।
৯০. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৮৫-২৮৬।
৯১. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৪০।
৯২. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, জিন্না/পাকিস্তান নতুন ভাবনা, প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৩৯৪, ষষ্ঠ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, কার্তিক ১৪১৭, ভূমিকা, পৃ. ৭।
৯৩. গৌরকিশোর ঘোষ, প্রতিবেশী, প্রথম সংস্করণ আগস্ট ১৯৯৫, তৃতীয় মুদ্রণ জুলাই, ২০১২, পৃ. ৩৩১।
৯৪. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩০২
৯৫. গৌরকিশোর ঘোষ, উপন্যাস সংগ্রহ, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৯৪, পঞ্চম মুদ্রণ আগস্ট ২০১৩, 'মনের বাঘ', পৃ. ৯৩-৯৪।
৯৬. সমগ্রন্থ, পৃ. ৯৪।
৯৭. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৩২।
৯৮. সমগ্রন্থ, পৃ. ৯৭।
৯৯. সমগ্রন্থ, পৃ. ১০০-১০১।
১০০. অন্নদাশঙ্কর রায়, নব্বই পেরিয়ে, প্রথম প্রকাশ জ্ম কলকাতা পুস্তকমেলা, মাঘ ১৪০২, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬, পঞ্চম সংস্করণ জ্ম জ্যৈষ্ঠ

১৪১৮, জুন ২০১১, পৃ. ৭৪।
১০১. গৌরকিশোর ঘোষ, উপন্যাস সংগ্রহ, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৯৪, পঞ্চম মুদ্রণ আগস্ট ২০১৩, 'মনের বাঘ', পৃ. ১১২-১১৩।
১০২. সমগ্রন্থ, পৃ. ১১২।
১০৩. সমগ্রন্থ, পৃ. ১২৮।
১০৪. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৪১।
১০৫. গৌরকিশোর ঘোষ, উপন্যাস সংগ্রহ, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৯৪, পঞ্চম মুদ্রণ আগস্ট ২০১৩, লোকটা, পৃ. ২১৫।
১০৬. সমগ্রন্থ, পৃ. ২১৬।
১০৭. গৌরকিশোর ঘোষ, উপন্যাস সংগ্রহ, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৯৪, পঞ্চম মুদ্রণ আগস্ট ২০১৩, 'গড়িয়াহাট ব্রিজের উপর থেকে, দুজনে' পৃ. ২৪৬।
১০৮. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৪৬।
১০৯. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৮২।
১১০. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৮৯।
১১১. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩০৮।
১১২. গৌরকিশোর ঘোষ, উপন্যাস সংগ্রহ, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৯৪, পঞ্চম মুদ্রণ আগস্ট ২০১৩, 'কমলা কেমন আছে', পৃ. ৪২২।
১১৩. সমগ্রন্থ, পৃ. ৪২৩।
১১৪. সমগ্রন্থ, পৃ. ৪২৫।
১১৫. সমগ্রন্থ, পৃ. ৪২৫।
১১৬. সমগ্রন্থ, পৃ. ৪৫০।
১১৭. সমগ্রন্থ, পৃ. ৪৭১।
১১৮. গৌরকিশোর ঘোষ, গল্পসমগ্র, প্রথম সংস্করণ মে ২০০৩, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি, ২০১২, 'এই কলকাতা', পৃ. ৩।
১১৯. সমগ্রন্থ, পৃ. ২০।
১২০. সমগ্রন্থ, পৃ. ২১।
১২১. সমগ্রন্থ, পৃ. ৪৩।
১২২. সমগ্রন্থ, পৃ. ৪৪।
১২৩. সমগ্রন্থ, পৃ. ৬০।
১২৪. গৌরকিশোর ঘোষ, গল্পসমগ্র, প্রথম সংস্করণ মে ২০০৩, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি, ২০১২, 'এই কলকাতা', পৃ. ৮৩।
১২৫. সমগ্রন্থ, পৃ. ৮৭।
১২৬. সমগ্রন্থ, পৃ. ৯১।
১২৭. গৌরকিশোর ঘোষ, গল্পসমগ্র, প্রথম সংস্করণ মে ২০০৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, 'ম্যানেজার', পৃ.১২৬।
১২৮. সমগ্রন্থ, পৃ. ১২৭।
১২৯. সমগ্রন্থ, পৃ. ১২৮।
১৩০. সমগ্রন্থ, পৃ. ১২৮।
১৩১. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৩৩।
১৩২. অমলেন্দু সেনগুপ্ত, জোয়ারভাটায় ষাট-সত্তর, পার্ল পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ মে, ১৯৯৭, পৃ. ৬২।
১৩৩. সমগ্রন্থ, পৃ. ৬২।
১৩৪. গৌরকিশোর ঘোষ, গল্পসমগ্র, প্রথম সংস্করণ মে ২০০৩, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, 'জবানবন্দী', পৃ.১৩৫।
১৩৫. সমগ্রন্থ, পৃ. ১৫০।
১৩৬. গৌরকিশোর ঘোষ, গল্পসমগ্র, প্রথম সংস্করণ মে ২০০৩, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, 'সাগিনা মাহাতো', পৃ.১৮৩।
১৩৭. সমগ্রন্থ।
১৩৮. সমগ্রন্থ।
১৩৯. সমগ্রন্থ।
১৪০. সমগ্রন্থ, ভূমিকা।
১৪১. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৩৬।
১৪২. সমগ্রন্থ, ভূমিকা।
১৪৩. অনিল আচার্য সম্পাদনা, সত্তরদশক খণ্ড এক, অনুষ্টুপ, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি, ১৯৮২, ৩য় মুদ্রণ, ২০১০, ভূমিকা, পৃ. ১৬।
১৪৪. গৌরকিশোর ঘোষ, গল্পসমগ্র, প্রথমসংস্করণ মে ২০০৩, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, 'সাগিনা মাহাতো' পৃ. ২৪১।

১৪৫. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৪৩।
১৪৬. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৪৬।
১৪৭. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৫২।
১৪৮. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৫২-২৫৩।
১৪৯. সমগ্রন্থ।
১৫০. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৫৩।
১৫১. অনিল আচার্য সম্পাদনা, সত্তর দশক, খণ্ড এক, অনুষ্টুপ, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি, ১৯৮২, ৩য় মুদ্রণ, ২০১০, ভূমিকা, পৃ. ১৯।
১৫২. গৌরকিশোর ঘোষ, 'গল্পসমগ্র' প্রথম সংস্করণ মে ২০০৩, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি, ২০১২, 'আমরা যেখানে', পৃ. ২৭৮।
১৫৩. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৬৮।
১৫৪. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৯১।
১৫৫. অনিল আচার্য সম্পাদনা, 'সত্তর দশক', খণ্ড তিন, বাংলার বিদ্রোহী যুবছাত্র আন্দোলন ঃ ১৯৬৬-৭০, অনুষ্টুপ, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি, ১৯৮২, ৩য় মুদ্রণ, ২০১০, পৃ. ১৭৩।
১৫৬. সমগ্রন্থ, পৃ. ৮৩-৮৪।
১৫৭. সমগ্রন্থ, পৃ.
১৫৮. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৫।
১৫৯. সমগ্রন্থ, পৃ. ৮১।
১৬০. গৌরকিশোর ঘোষ, গল্পসমগ্র ঃ প্রথম সংস্করণ মে ২০০৩, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, 'বাঘবন্দীর খেলা', পৃ. ২৭৫।
১৬১. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৭৬।
১৬২. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৭৬।
১৬৩. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৬৫।
১৬৪. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৮২।
১৬৫. সমগ্রন্থ, পৃ. ২৮২-২৮৩।
১৬৬. গৌরকিশোর ঘোষ, গল্পসমগ্র ঃ প্রথম সংস্করণ মে ২০০৩, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, 'গুলিয়ে যাবার আগে', পৃ. ৩৩২।
১৬৭. গৌরকিশোর ঘোষ, গল্পসমগ্র ঃ প্রথম সংস্করণ মে ২০০৩, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, হঠাৎ জোয়ার, পৃ. ৩৪৩।
১৬৮. সমগ্রন্থ, পৃ. ৩৪৪।
১৬৯. অমলেন্দু সেনগুপ্ত, জোয়ারভাটায় ষাট-সত্তর, পার্ল পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ মে, ১৯৯৭, দ্বিতীয় পর্ব, পৃ. ৫১।
১৭০. সমগ্রন্থ, চতুর্থ পব, পৃ. ২০৫।
১৭১. সমগ্রন্থ, চতুর্থ পব, পৃ. ২১০-২১১।
১৭২. গৌরকিশোর ঘোষ, গল্পসমগ্র ঃ প্রথম সংস্করণ মে ২০০৩, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, 'পশ্চিমবঙ্গ এক প্রমোদতরণী হা হা, দৃশ্য আটাশ', পৃ. ৪১৫।
১৭৩. অমলেন্দু সেনগুপ্ত, জোয়ারভাটায় ষাট-সত্তর, পার্ল পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ মে, ১৯৯৭, চতুর্থ পর্ব, পৃ. ২১৭।
১৭৪. গৌরকিশোর ঘোষ, গল্পসমগ্র ঃ প্রথম সংস্করণ মে ২০০৩, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, 'পশ্চিমবঙ্গ এক প্রমোদতরণী হা হা, দৃশ্য আটাশ', পৃ. ৪১৬।
১৭৫. সমগ্রন্থ, পৃ. ৪১০।
১৭৬. সমগ্রন্থ, পৃ. ৪১১।
১৭৭. সমগ্রন্থ, পৃ. ৪১৪।
১৭৮. অমলেন্দু সেনগুপ্ত, জোয়ারভাটায় ষাট-সত্তর, পার্ল পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ মে, ১৯৯৭, পৃ. ২১১।
১৭৯. সমগ্রন্থ, পৃ. ২১১।
১৮০. গৌরকিশোর ঘোষ, গল্পসমগ্র ঃ প্রথম সংস্করণ মে ২০০৩, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২, 'উপস্থাপনা'।
১৮১. গৌরকিশোর ঘোষ, দাসত্ব নয়, স্বাধীনতা, প্রথমসংস্করণ জুন ২০১৫, পৃ. ২২।